কনকতরী

প্রথম প্রকাশঃ ২০০৩

এক

পুন্টা হিগুয়েরো, পুয়ের্টো রিকোর মায়াহুয়েজ আর অ্যাকুয়াডিয়া শহরের ঠিক মাঝখানে। দীর্ঘ একটা আঙুল যেন, বেরিয়ে এসেছে মোনা প্যাসেজের গাঢ় নীল সাগরের বুকে তর্জনীর মত। ডোমিনিকান মেইনল্যান্ড থেকে পুন্টার দূরত্ব একশো মাইল। মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পুয়ের্টো রিকোর রুপোলি-নীল গভীর জলরাশি। সরু একটা প্যাসেজ ওটা, পাথুরে, কোরাল রীফের কারণে কোথাও কোথাও অগভীর এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক।

মোনা প্যাসেজে বিচিত্র সামুদ্রিক প্রাণীর অভাব নেই। নিরীহ প্রাণী যেমন আছে, তেমনি আছে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হাঙর, ব্যারাকুডা আর অন্যান্য মাছ। হারিকেন অঞ্চল। অগভীর পানিতে নিমজ্জিত জাহাজেরও সীমাসংখ্যা নেই। কয়েক শতাব্দীর জাহাজ রয়েছে তার মধ্যে। আছে স্প্যানিশদের স্বর্ণবাহী গ্যালিয়ন। অবশ্য ওগুলোর সমস্ত সম্পদ বহু আগেই উদ্ধার করা হয়ে গিয়েছে। একচিলতে সোনাও আর পাওয়া যায় না এখন। তবে জাহাজ থেকে ফেলা এবং পড়ে যাওয়া জিনিস ঢেউয়ের সঙ্গে তীরে চলে আসে, সেগুলো সংগ্রহের জন্যে বালুকাবেলায় এখনও ঘুরে বেড়ায় বীচ খেউমা (Comber)রা বা সৈকত-টোকাইরা।

এখন মাঝ আগস্ট। ভারী বাতাসে ভাসছে অগ্রসরমান হারিকেনের গন্ধ। একজন বীচ খেউমা নির্জন ঝড়ো সৈকতে হাজির, সোনালী বালির ওপর দিয়ে ধীর পায়ে পুন্টা হিগুয়েরোর দিকে এগোচ্ছে সে। লোকটা বেশ দীর্ঘ, চওড়া কাঁধদুটো দেখলে মনে হয় রাগবি খেলে। সরু কোমর, শক্তিশালী পা। তবে শারীরিক শক্তিমত্তা ততটা বোঝা যাচ্ছে না এখন। লোকটার পরনে গরিবী পোশাক, হাঁটছে কাঁধ ঝুঁকিয়ে একটু কুঁজো হয়ে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এক পায়ের বুড়ো আঙুল বেরিয়ে এসেছে ছেঁড়া জুতোর নাক ছিঁড়ে। শার্টটা তালিপট্টি মারা। নোংরা জিন্সের প্যান্ট দেখলে মনে হয় কোনদিন ধোয়া হয়নি। গালে তার চারদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথায় একটা ছেঁড়া স্ট্র হ্যাট। চেহারা দেখলে বোঝা যায় কষ্টে আছে। ভকভক করে সস্তা হুইস্কির গন্ধ বের হচ্ছে মুখ থেকে। তবে টলছে না সে, ধীর পায়ে সৈকতের ওপর দিয়ে তারের বেড়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। বারোটা তার দিয়ে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে বেড়া। তার ওপর আছে কয়েক সারি কাঁটাতার, নেমে গেছে অগভীর পানিতে, যাতে সৈকত থেকে কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারে।

শার্টের পকেট থেকে তামাক বের করে সিগারেট তৈরি করতে একটু থামল বীচ খেউমা। তার পিঠে একটা পুরানো আর্মি ন্যাপস্যাক ঝুলছে, হাতে একটা লাঠি। লাঠির এক মাথা চেঁছে চোখা করা।

অলস ভাবে সিগারেট তৈরি করে সৈকতের শেষ মাথায় এসে দাঁড়াল সে। সোনালী সৈকতে সাদা ফেনা রেখে ফিরে যাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ। সামুদ্রিক বাতাস থেকে আড়াল করে সিগারেটটা ধরাল সে, একটা এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, আসছে এদিকেই। সম্ভবত জীপ গাড়ি। লোকটার দাড়িভরা চেহারায় ক্ষণিকের জন্যে মৃদু হাসি দেখা দিল।

নাক-মুখ দিয়ে নীল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে উঁচু বেড়াটার দিকে এগোল সে, ভাব দেখে মনে হলো না কোনও বিপদের আশঙ্কা করছে। এবার জীপটাকে দেখতে পেল, একটা বালির ঢিবির গা বেয়ে আড়াআড়ি আসছে। দু'জন লোক আছে জীপে, পরনে খাকি ইউনিফর্ম। ড্রাইভার লোকটাকে দূর থেকে দেখে নিগ্রো বলে মনে হলো। তার পাশের লোকটা সাদা, বেঁটে এবং মোটা। মাথায় অস্ট্রেলিয়ান বুশ হ্যাট।

বেড়ার কাছে পৌঁছে গেছে বীচ খেউমা, মাথা উঁচু করে কাঁটাতারের সারি দেখল। বেড়ার নিচে কংক্রিটের দেয়াল, যাতে তলা দিয়ে খুঁড়ে ভেতরে কেউ ঢুকতে না পারে। খুঁটির গায়ে ঝুলছে একটা সাদা সাইনবোর্ড। লাল হরফে স্প্যানিশে লেখাঃ *আর এগোবেন না। ট্রেসপাসারদের কড়া জিজ্ঞেসাবাদ করা হবে।* একই কথা ইংরেজিতেও লেখা আছে।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সৈকতের প্রান্তে চলে গেল বীচ খেউমা, বেড়ার শেষ মাথা পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢোকার ইচ্ছে। ঘ্যাচ করে ব্রেক করে থামল জীপটা, বিশ ফুট দূরেও নয়। সাদা লোকটা লাফ দিয়ে নামল জীপ থেকে, দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে।

'দাঁড়াও!' কড়া গলায় নির্দেশ দিল লোকটা। 'আর এগোবে না। অক্ষরজ্ঞান নেই নাকি? দেখছ না সাইনবোর্ডে কি লেখা আছে?'

বেড়ার পাশে থমকে দাঁড়িয়ে হাতের লাঠিতে ভর দিল বীচ খেউমা, তাকিয়ে আছে এগিয়ে আসা মোটা লোকটার দিকে। আন্দাজ করল লোকটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। নড়াচড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে দেহে যথেষ্ট শক্তি রাখে। আর্মিতে ছিল বোধহয়। পরনে আর্মির জুতো, তবে মোজাটা সাদা। খাকি হাফ প্যান্ট আর বুশ জ্যাকেট পরে আছে। প্যান্ট আর জ্যাকেট ইস্ত্রি করা, নতুন। জ্যাকেটের বুকের কাছটা ফাঁক হয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে কাঁচাপাকা ঘন লোম। মোটা কোমরে ঝুলছে একটা ওয়েব হোলস্টার। ওরকম হোলস্টার ইংরেজ আর অস্ট্রেলিয়ান আর্মি অফিসাররা ব্যবহার করে। বোতামবন্ধ ফ্ল্যাপের তলা দিয়ে চকচকে কালো একটা রিভলভারও দেখতে পেল বীচ খেউমা।

বেড়ার দু'পাশে মুখোমুখি দাঁড়াল দুজন, পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। সশস্ত্র লোকটাই প্রথমে মুখ খুলল। 'কি ব্যাপার, কি লেখা আছে পড়তে পারো না?'

মোটকুর চোখের দৃষ্টির সামনে ইচ্ছে করেই চোখ নামিয়ে নিল বীচ খেউমা। অন্যদিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলল, 'পড়েছি। কিন্তু সাইনবোর্ডের কথা মেনে চলতে হবে হবে কেন? আমি তো কারও কোনও ক্ষতি করছি না, সৈকতে খুঁজে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

দেখছি কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

বুড়ো আঙুল দিয়ে সাইনটা আবার দেখাল মোটকু। 'ওখানে যা লেখা আছে সেটা খামোকা লেখা হয়নি। ভেতরে ঢুকলে বিপদ ছাড়া আর কিছুই পাবে না তুমি। যা বলছি করো, সরে পড়ো এখান থেকে।'

চট করে জীপে বসা নিগ্রো ড্রাইভারের ওপর থেকে ঘুরে এলো বীচ খেউমার দৃষ্টি। পেছনের সীট থেকে একটা স্টেনগান হাতে তুলে নিয়েছে সে। না, এরা ভড়কি দিচ্ছে না।

সামনের লোকটার ওপর দৃষ্টি ফেরাল বীচ খেউমা। এবার তার চোখে জেদ আর রাগের ছাপ। 'আমি তো বলেছি কারও কোন ক্ষতি করছি না। এভাবে আমাকে বেড়া দিয়ে আটকে দেয়ার অধিকার নেই আপনাদের।'

মোটকুর লাল চেহারায় ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল। ধূসর ভ্রূ জোড়ার নিচে জ্বলজ্বল করে উঠল নীল দুই চোখ। চোখের নিচে ঝুলছে মাংসের পুটলি। নাকটা ভাঙা। অনেকদিন আগে ভেঙেছিল, হাড় নেই। সরু ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসায় লম্বা একটা রেখার মত লাগছে মুখটা। কাঁচাপাকা লোমওয়ালা একটা হাত ওয়েব হোলস্টারের ওপর রাখল সে।

কথা যখন বলল তখন বলল অত্যন্ত শান্ত, প্রায় বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠে। 'কাউকে ঢুকতে না দেয়ার অধিকার আছে আমার, বুঝলে? এটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমি আছি কাউকে ঢুকতে না দেয়ার দায়িত্বে। এই বেড়া থেকে অন্য প্রান্তে পাঁচ মাইল দূরের বেড়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এটা প্রস্থে। দৈর্ঘ্যে জমি আছে দশ মাইল। কাউকে ঢুকতে না দেয়ার আইনগত অধিকার আছে আমার। বিশ্বাস না করলে কোনও উকিলের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো।'

হোলস্টারের ওপর থেকে হাত সরিয়ে উরুর পাশে রাখল সে, ঠোঁট সামান্য ফাঁক করে করুণার হাসি নিয়ে বীচ খেউমাকে দেখল। 'আমার কথা বুঝতে পেরেছ? দেখতে তুমি যতই নির্বোধের মত হও না কেন, বুঝতে না পারার কোনও কারণ তো দেখতে পাচ্ছি না। সোজা নিজের পথে চলে যাও, তাতে তোমার আমার দু'জনেরই অনেক ঝামেলা কমবে।' কঠোর হয়ে গেল চেহারাটা। 'যেদিক থেকে এসেছ সেদিকেই যাবে তুমি, বুঝেছ?'

বীচ খেউমা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে মোটা লোকটার দিকে। আকৃতির দিক দিয়ে লোকটা তার তুলনায় অনেক ছোট। কাঁধ সোজা করল বীচ খেউমা, দেখে মনে হলো দৈর্ঘ্যে অন্তত এক ফুট বেড়ে গিয়েছে সে। ঘাড়-ত্যাড়ামির একটা ভাব ফুটল তার চেহারায়, আসলে দেখতে চাইছে প্রয়োজনে কতটা বেপরোয়া হবে লোকগুলো। একবারও সাগরের দিকে তাকাচ্ছে না। চায় না এক মাইল দূরবর্তী দ্বীপটার ব্যাপারে তার কোনও কৌতূহল আছে সেটা এরা বুঝতে পারুক।

'আমার তো মনে হয় আইন আমার পক্ষে আছে,' বলল বীচ খেউমা। 'আইন বলে ডাঙা পর্যন্তই সম্পত্তির সীমা, সাগরে কারও কোনও সম্পত্তি থাকতে পারবে না। তোমাদের বেড়াও ওই পর্যন্তই। আমি যদি ওটা এড়িয়ে পানির ওপর দিয়ে যাই তাহলে সেটাকে ট্রেসপাসিং বলা যায় না। কি, আমি ঠিক বলেছি, মিস্টার?'

ব্যাগ নামিয়ে চ্যাপ্টা একটা মদের বোতল বের করল বীচ খেউমা। বোতলটা সোনালী তরলে অর্ধেক ভর্তি। সামনের লোকটার ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই সস্তা হুইস্কির বোতলে চুমুক দিল সে। সতর্ক, যাতে বেশি মদ পেটে না যায়। বোতলের মুখে জিভটা খানিকটা ঢুকিয়ে রেখেছে। ড্রিঙ্ক করলে অসুবিধে নেই তার, কিন্তু হুইস্কিটা এতই বাজে আর কম দামী যে বাড়াবাড়ি করতে গেলে বমি হয়ে যেতে পারে। বমি করে ফেললে এত কষ্ট করে জমানো নাটক মাটি হয়ে যাবে।

চোখে ঈর্ষা নিয়ে বীচ খেউমাকে মদ গিলতে দেখছে জোসেফ ক্যালডন। অস্ট্রেলিয়ান আর্মিতে এক সময় মেজর ছিল, এখন সে কবীর চৌধুরীর ব্যক্তিগত বাহিনীর প্রধান। ভাল বেতন পায় সে, কিন্তু কবীর চৌধুরী তার মদ খাওয়ায় বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এক সপ্তাহ আগে তাকে শেষ বারের মত সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, সেই থেকে সে তৃষ্ণার্ত। এখন এক পেগ ড্রিঙ্কের জন্যে যা খুশি করতে পারবে বলে মনে হলো ওর। চোখের সামনে কেউ মদ না খেলে হয়তো কষ্ট করে নিজেকে সামলে রাখতে পারত। কিন্তু এখন হারামজাদা ভবঘুরে টোকাই চোখের সামনে হুইস্কি গিলছে। ব্যাপারটা তার কাছে রীতিমত অত্যাচারের সামিল মনে হলো। রাগে জ্বলে উঠল সারাশরীর। বীচ খেউমাকে একহাত নেয়ার তীব্র ইচ্ছে জেগে উঠল তার অন্তরে।

সে কিছু বলার আগেই বেড়ার ফাঁক দিয়ে বোতলটা বাড়িয়ে দিল বীচ খেউমা। 'কি, মিস্টার, চলবে নাকি একটু?'

খপ করে বোতলটা ধরে ওর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল জোসেফ, ঠোঁটে তুলে চোখ বুজে চুমুক দিল। ঢকঢক করে গিলছে। ঘনঘন ওঠানামা করছে কণ্ঠার হাড়। সস্তা কড়া হুইস্কি, কিন্তু ওটাই জোসেফের মনে হলো দুনিয়ার সেরা মাল। দুনিয়ায় আনন্দ বলতে তো এই মদ খাওয়াই, আর কি!

ক্ষণিকের জন্যে বোতলটা নামাল সে, বড় করে শ্বাস নিয়ে হাতের উল্টোপিঠে মুখ মুছল, তারপর আবার মুখে তুলল।

বেড়ার এপাশে দাঁড়িয়ে আছে বীচ খেউমা, খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা চেহারায় প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস। কিছুই তার চোখ এড়াচ্ছে না। কাত করে পরা বুশ হ্যাটের সামনের দিকে একটা ইনফ্যান্ট্রি ব্যাজ দেখা যাচ্ছে। রয়াল অস্ট্রেলিয়ান রাইফেলসের ব্যাজ। নামকরা একটা রেজিমেন্ট। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওই বুশ হ্যাটটা মোটা লোকটার গর্বের জিনিস। ব্যবহারের ফলে কাপড় কোথাও কোথাও পাতলা হয়ে গেছে, বয়সের ভারে কুঁচকে গেছে অনেক জায়গায়, কিন্তু হ্যাটটা পরিষ্কার, চকচক করছে ব্যাজটা। আর্মিতে ছিল লোকটা, ভাবল বীচ খেউমা। দেখেই বোঝা যায় অ্যালকোহলিক। কথাটা মনে গেঁথে রাখল সে।

হুইস্কি শেষ করেছে জোসেফ ক্যালডন, বোতলটা ফিরতি ঢেউয়ের মাঝে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বীচ খেউমার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'সরি, বাম্, হুইস্কি দেখলে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

আর নিজেকে সামলাতে পারি না। বদ অভ্যেস। আমার মা বহু চেষ্টা করেও আমাকে বোতল ছাড়াতে পারেনি।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল বীচ খেউমা। 'আমি কিছু মনে করিনি, বন্ধু। ব্যাগে আরও এক বোতল আছে। তৃষ্ণার্ত মানুষকে ড্রিঙ্ক দিতে ভাল লাগে আমার।' আবার বোকার মত হাসল সে, বালিতে দাগ কাটল ছেঁড়া জুতো দিয়ে। 'আসলে আমি খুব বন্ধুবৎসল মানুষ, বুঝলে? নিজের মত চলি, কারও কোনও ক্ষতির মধ্যে আমি নেই।'

ছন্নছাড়া ভবঘুরে হাভাতে লোকটার দিকে তাকিয়ে একটা ভাবনা খেলে গেল জোসেফ ক্যালডনের মাথায়, হাসি চেপে রাখল সে। হুইস্কি শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু একে নিয়ে এখনও সামান্য মজা করার অবকাশ আছে।

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল সে হতদরিদ্র লোকটার দিকে। 'ভেবো না ওই হুইস্কির জন্যে তুমি কোনও সুবিধে পাবে আমার কাছে। এবার যাও, সোজা কেটে পড়ো। বীট ইট! রওনা হয়ে যাও, যেদিক থেকে এসেছিলে।'

বীচ খেউমা কিছু বলার আগেই নিচু গলায় ডাক দিল নিগ্রো ড্রাইভার, ইশারায় কব্জি দেখাচ্ছে। অনেকখানি সৈকত তাদের টহল দিতে হবে। সম্ভবত এরা একা নয়, সৈকতের অন্য প্রান্ত থেকে টহল দিয়ে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসছে অন্তত আরেকটা জীপ।

ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে ইশারা করল ক্যালডন, বীচ খেউমার দিকে ফিরল, এবার তার কণ্ঠস্বর অনেক নরম শোনাল। 'ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে, এখন আর কঠোর হতে পারব না। তাছাড়া তোমার সমস্ত হুইস্কি আমি শেষ করে ফেলেছি। বিনিময়ে কিছু অন্তত করা উচিত আমার। ঠিক আছে, যাও তুমি। তবে সাবধান থেকো, পানি ছেড়ে ডাঙার দিকে আসবে না, আর পথে কোথাও থামবে না।...দাঁড়াও, আর কোনও দলের হাতে পড়তে পারো, যাতে বিপদ না হয় সেজন্যে একটা নোট লিখে দিচ্ছি।' পকেট থেকে কাগজ বের করে কি যেন লিখে ভাঁজ করে বাড়িয়ে দিল সে।

ওটা হাতে নিয়ে ক্যালডনের চোখে তাকাল বীচ খেউমা। দৃষ্টিটা তার পছন্দ হলো না। লোকটার ঠোঁটে হাসির রেখাটাও সতর্ক করছে তাকে, কিন্তু পাত্তা না দিয়ে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার। এদিক দিয়ে না গেলে আমাকে অনেক পথ ঘুরে যেতে হত। সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ।'

চওড়া হাসল ক্যালডন। 'যাও তাহলে। দেরি কিসের, যেকোন মুহূর্তে আমি হয়তো মত বদলে ফেলতে পারি, শিগগির রওনা হয়ে যাও।' কথা শেষ করে জীপ গাড়ির দিকে পা বাড়াল সে, নিগ্রো ড্রাইভার অধৈর্য চেহারায় হাতে স্টেনগান নিয়ে অপেক্ষা করছে।

বেড়ার শেষ প্রান্ত পার হয়ে পানির ভেতর দিয়ে এগোল বীচ খেউমা, জুতো ভিজে গেছে সেটা কেয়ার দিচ্ছে না। মাইলের পর মাইল সৈকত পাড়ি দিতে হবে তাকে, ধীরেসুস্থে চলেছে। জীপটা নিচু গিয়ারে রওনা হয়ে গেল, আওয়াজ শুনতে পেল সে। পেছনে ফিরে তাকাল না, কিন্তু দেহের প্রতিটা পেশি টানটান হয়ে গেল তার, ঝড়ের বেগে কাজ করছে মাথা, ভাবছে এরপর কি আসতে পারে। অসি খুব দ্রুত তার সিদ্ধান্ত পাল্টেছে, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। লোকটার নীচ চোখে চাতুরির ছাপ ঢাকা থাকেনি। জীপটা দ্বিতীয় গিয়ারে চলছে এখন, চওড়া টায়ারগুলো বালিতে দাঁত বসানোয় স্পীড বাড়ছে দ্রুত। ওর আড়াআড়ি এগিয়ে চলেছে জীপটা, কিন্তু দূরত্ব বজায় রাখছে পঞ্চাশ গজ।

হঠাৎ করেই অস্ট্রেলিয়ান লোকটার চিৎকার শুনতে পেল, 'অ্যাই হারামজাদা! অ্যাই! এখানে কি!'

চমকে গেছে এমন ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল বীচ খেউমা। স্পষ্ট বুঝতে পারছে কি ঘটতে চলেছে। লোকটা নোংরা আনন্দ পাবার লোভ সামলাতে পারবে না।

পঞ্চাশ গজ দূরে থেমে দাঁড়াল জীপ। নিগ্রো ড্রাইভার হাসছে, গ্যাস পেডালে পায়ের চাপ বাড়াল, আবার এগিয়ে আসতে শুরু করল জীপটা। স্টেনগান এখন অস্ট্রেলিয়ান লোকটার হাতে। হাসছে সে-ও।

'কিরে ব্যাটা, জানিস না অনধিকার প্রবেশ করেছিস তুই? দাঁড়া তোকে এমন শিক্ষা দেব...'

এক পশলা গুলি করল ক্যালডন। বীচ খেউমার পায়ের কাছে বালিতে নাক গুঁজল বুলেটগুলো। একটা বুলেট লোকটার ছেঁড়া জুতোর গোড়ালিতে আঁচড় কেটে গেল। হাত থেকে লাঠি ফেলে হাত দুটো মাথার ওপর তুলে ফেলল বীচ খেউমা, বেকায়দা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত স্বরে চেঁচাল, 'গুলি করবেন না! গুলি করবেন না, সার! আর আসব না! ফিরে যাচ্ছি আমি! দয়া করে গুলি করবেন না!'

নিগ্রো ড্রাইভার আর অস্ট্রেলিয়ান প্রাক্তন মেজর, দু'জনই গলা ছেড়ে হাসছে। আরও একটু এগিয়ে এল জীপটা। আরেক দফা গুলি বের হলো স্টেনগান থেকে। বীচ খেউমার পায়ের কাছে বালি ছিটকে উঠল। একটা বুলেট লাগল তার পিঠে ঝোলানো ব্যাগে।

'নাচ, শালা!' হাসির ফাঁকে চিৎকার করল ক্যালডন। 'নাচ!'

মাথার ওপর দু'হাত তুলে রেখেই বেড়া পার হয়ে নিষিদ্ধ এলাকা থেকে বের হতে দৌড় দিল বীচ খেউমা। সমানে চেঁচাচ্ছে, 'মারবেন না, স্যার! মারবেন না!'

তার পায়ের কাছে বালি খুঁড়ছে স্টেনগানের বুলেট। ছপাৎ ছপাৎ পানি ভেঙে বেড়া পার হয়ে বেড়ার বাইরের সৈকতে চলে এল সে। লম্বা লম্বা পায়ে ঝেড়ে দৌড়াচ্ছে। এখন আর তার চেহারা দেখতে পাচ্ছে না বেড়ার ওপারের লোকগুলো। গুলি বন্ধ হয়ে গেছে। হাসি ফুটে উঠল রানার চেহারায়, যেজন্যে এসেছিল তা জানা হয়ে গিয়েছে। কবীর চৌধুরীর আস্তানা এটা। গ্যালোস কে। এবার মার্ভিন লংফেলোর নির্দেশিত জায়গায় খায়রুল কবিরের প্রেমিকা ডোনা ডানের সঙ্গে দেখা হলে জানা যাবে সোনা উদ্ধার করতে হলে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তাকে।

ওর মাথার ওপর দিয়ে বাতাসে শিস কেটে ছুটে গেল আরেকটা বুলেট। দৌড় থামাল না রানা। দৌড়াচ্ছে মাথার ওপর দু'হাত তুলে। রাহাত খানের কথা

www.MurchOna.com

ভাবল ও। এখন যদি তিনি দেখতেন ওর দৌড়, তাহলে মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত।

দুই

রানা এজেন্সি। লন্ডন।

ঠোঁটে সিগারেট, চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিলে দু'পা তুলে আয়েস করে বসে আছে রানা, কোলের ওপর মোটা একটা ফাইল, গভীর মনোযোগে পড়ছে ওটা। স্বামী খুন হয়েছে। স্ত্রী দায়ী নয় সম্ভবত। দু'জনেরই পরকীয়া প্রেম ছিল। দু'জনই দু'জনের ব্যাপারটা জানত, এ নিয়ে তাদের মাঝে সমঝোতাও ছিল। এখন রানা ভদ্রলোকের ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্যগুলো পড়ছে। জটিল কেস। দরজার বাইরে ঝুলছে ডু নট ডিস্টার্ব লেখা কার্ড।

দরজায় নক হলো। টেবিল থেকে পা নামিয়ে নিল রানা।

'কাম ইন।'

হাসান ঢুকল ঘরে। 'মাসুদ ভাই, বিরক্ত করলাম।'

হাসল রানা। 'করে তো ফেলেছ। কি দরকার?'

'হংকং থেকে একটা মেসেজ এসেছে, মাসুদ ভাই, আমাদের এজেন্ট পাঠিয়েছে।' টেবিলে রানার সামনে চিকন একটা ফাইল নামিয়ে রাখল হাসান। 'বলছে কবীর চৌধুরী একটা জাহাজ নিয়ে হংকং ছেড়েছে। সম্ভবত তার সঙ্গে বাংলাদেশী তেল বেচা দুই বিলিয়ন ডলারের সোনা আছে।' রানা চুপ করে আছে দেখে চেহারাটা আরও গম্ভীর করে তুলল হাসান। 'সি আই এ-র একটা তদন্ত রিপোর্টে পড়লাম, পুয়ের্টো রিকোয় সরকারের কাছ থেকে প্রচুর জমি লীয নিয়েছে কবীর চৌধুরী, ছদ্মনামে। সরকারকে গবেষণার কাজে সাহায্য করায় তার এলাকায় কাউকে নাক গলাতে দেবে না ওরা।'

আড়মোড়া ভেঙে সিধে হয়ে বসল রানা। পূর্ণ গতিতে কাজ শুরু করেছে মাথা। হাসান বিসিআই জুনিয়ার এজেন্ট, কাজেই জিজ্ঞেস করল, 'বস্ জানেন?'

'মেজর জেনারেল? জানেন। হংকং থেকে তাঁর কাছেই মেসেজটা আগে পাঠানো হয়েছে।'

লাল ফোনটার দিকে তাকাল রানা, কুসংস্কারে ওর বিশ্বাস নেই, নইলে নিজেকে পীর-ফকির-মিসকিন বলে দাবি করতে পারত। ও তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে পিঁইপ পিঁইপ করে বেজে উঠল লাল ফোন। হাসানকে বসতে ইঙ্গিত করে ক্রেডল কানে ঠেকাল রানা।

'রানা?'

রানার বুকের ভেতর একঝলক রক্ত ছলাৎ করে উঠল রাহাত খানের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে।

'জ্বী, স্যার।'

'শুনেছ? কবীর চৌধুরী রওনা দিয়েছে।'

'এই মাত্র শুনলাম, স্যার।'

'হাতের সমস্ত কাজ বুঝিয়ে দাও অন্যদের। এখুনি পুয়ের্টো রিকো যাচ্ছ তুমি। ধারণা করছি কবীর চৌধুরী জাহাজ ত্যাগ করে এতক্ষণে ওখানে পৌঁছে গেছে।'

'জ্বী, স্যার।'

'খায়রুল কবীরের বর্তমান প্রেমিকা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের স্লীপার এজেন্ট। তার কাছ থেকে জানা গেছে পুয়ের্টো রিকোতে ঘাঁটি গেড়েছে কবীর চৌধুরী। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে ওখানে মেয়েটা তোমার সঙ্গে দেখা করবে। রওনা হওয়ার আগে কোথায় দেখা হবে সেটা লংফেলোর কাছ থেকে জেনে নিয়ো। রানা, আশা করছি সফল হবে তুমি। সোনাগুলো আমাদের তেল বিক্রির টাকায় কেনা। ওগুলো আশা করছি উদ্ধার করতে পারবে।'

খুট করে একটা আওয়াজ হলো। রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন রাহাত খান।

*

পাঁচদিন আগে লন্ডন ছেড়েছে ও, প্যান অ্যামের ফ্লাইটে পুয়ের্টো রিকো পৌঁছেছে। এখন বসে আছে লক্কড়মার্কা একটা গাড়িতে, বেড়া থেকে তিন মাইল দূরে, কোস্টাল হাইওয়ে থেকে এক হাজার গজ দূরে জঙ্গলের ভেতর একটা ফাঁকা জায়গায়।

চাঁদ ওঠেনি আজ রাতে। নিশাচর পাখি আর পোকামাকড়ের কোনও আওয়াজ নেই, চারপাশ কবরের মত নীরব। দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে হারিকেন নামের সমূহ বিপদ এগিয়ে আসছে সেটা কিভাবে যেন বুঝে ফেলেছে প্রাণীগুলো।

চাঁদ ঢেকে রাখা মেঘ ছাড়া নড়ছে না কোনও কিছু। অনেক উঁচুতে ভাসছে মেঘগুলো, রং দেখে মনে হয় কারখানার নোংরা ধোঁয়া দিয়ে তৈরি। বেশিরভাগ নক্ষত্রও ঢাকা পড়েছে ওই মেঘে। দাড়ির চুলকানি অসহ্য ঠেকায় গাড়ির ফেন্ডার মিররটা ব্যবহার করে ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় শেভ করল রানা। সান হুয়ানের এসমারেল্ডো থেকে উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের এই ভাঙাচোরা গাড়িটা কিনেছে ও। জিনিসটা এতই পুরানো যে ওর কাভারের সঙ্গে মানিয়ে গেছে চমৎকার।

পুয়ের্টো রিকো অত্যন্ত জনবহুল হলেও এত পশ্চিমের এই বিরান অঞ্চলে লোক বসতি প্রায় নেই বললেই চলে। দক্ষিণে সবচেয়ে কাছের গ্রাম বলতে রিংকন, সেটাও অনেক দূরে। এলাকাটা এতই নির্জন যে কনড্যাডো, ডাইভ-ইন আর সুপারমার্কেট এদেশে আছে বলে বিশ্বাস হয় না। পাহাড়ী অঞ্চল এটা। সবুজ টিলার দেশ। ছাড়া ছাড়া ভাবে যারা এখানে বাস করে তারা এখনও ঝোপ দিয়ে তৈরি কুঁড়েতে থাকে।

সারাদিনের ঘটনাগুলো একবার ঝালিয়ে নিল রানা মনে মনে, আগামীকালের

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

ঝুঁকিগুলোর কথা ভাবছে। কালকে দেখা করার কথা খায়রুল কবীরের নতুন প্রেমিকা ডোনা ডানের সঙ্গে। সোনা কবে আসবে সেটা জানা যাবে। সম্ভবত দু'তিনদিনের মধ্যেই আসবে। সেক্ষেত্রে বলতে হয় বড় দেরি হয়ে গেল। এখন আর বাংলার গৌরবে গিয়ে সোনা উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয়ার সময় নেই। সোহেলকে খবরটা জানিয়ে দিতে হবে। যা করার সোহেলই করবে।

ফ্ল্যাশলাইটটা নিয়ে সরু একটা বুনো পথ ধরে লাইমস্টোনের তৈরি প্রাকৃতিক একটা ডোবার পাড়ে চলে এল রানা। টিলা থেকে নামা সরু জলধারায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে ডোবাটা। পরিষ্কার টলটলে পানি। চারধারে হিবিসকাস, অলিন্ডার, পইনসিয়ানা আর কোকো পামগাছ দিয়ে ঘেরা। পুবের পাহাড়ে জন্মেছে বুনো কলা আর স্ট্রবেরি। দক্ষিণে মায়াহুয়ারেজের দিকে সরু সৈকতরেখায় আছে ঘন আখের জঙ্গল। পুয়ের্টো রিকোর জমি উর্বর, প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নেই, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার হয় না। অনেকটা বাংলাদেশের মতই অবস্থা। চাইলে অনেক কিছুই করা সম্ভব, কিন্তু অব্যবস্থাপনার কারণে কিছুই হচ্ছে না। দেশে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবই এর মূল কারণ।

জামাকাপড় খুলে একটা বাটারফ্লাই গাছের গোড়ায় রাখল রানা, ফ্ল্যাশলাইটটা একটা পাথরের ওপর নামিয়ে রেখে নেমে পড়ল প্রাকৃতিক সুইমিং পুলে। ঈষৎ উষ্ণ পানির পরশে মনে হলো নরম ভেলভেট শরীরকে জড়িয়ে ধরেছে। ইচ্ছে মত সাবান মাখল ও, তারপর ডুব দিল কয়েকবার। শেষে আয়েস করে পাথরে হেলান দিয়ে বসল। সারা শরীর পানির তলায়, শুধু মাথাটা জেগে আছে।

এখন যদি অস্ট্রেলিয়ান লোকটা রানাকে দেখত তাহলে বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠত তার। দ্বিতীয়বার তাকে ভাবতে হত বিকেলে কি পরিমাণ ঝুঁকি নিয়েছে চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্র যুবককে নিয়ে বিপজ্জনক খেলা করতে গিয়ে। রানার প্রতিটা নড়াচড়ায় সাবলীল পৌরুষদীপ্ত ছন্দ।

দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল করল রানা। গোসল শেষে সন্তুষ্ট মনে ফিরে গেল গাড়িটার কাছে। মনটা ফুরফুর করছে, হালকা শিস দিচ্ছে ও।

ওর লড়ঝড়ে গাড়িটায় একটা জিনিস একেবারেই বেমানান। পেছনের সীটের নিচে একটা ফল্‌স্ কম্পার্টমেন্ট তৈরি করা হয়েছে স্থানীয় বিসিআই কন্ট্যাক্টের সহায়তায়। খুব তাড়াহুড়োয় তৈরি হলেও পেশাদার কারও পক্ষেও কম্পার্টমেন্টটা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। ড্যাশবোর্ড থেকে একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় সীট উঁচিয়ে একটা স্ক্রু খুলল রানা। লম্বা গর্তটায় একসঙ্গে অনেক কিছু ঠাঁই পেয়েছে। নতুন একটা ডেনিম জিন্সের প্যান্ট আর স্পোর্ট শার্ট পরে নিয়ে সবকিছু একবার চেক করল ও। সন্তুষ্ট হয়ে পায়ে গলাল একটা স্যান্ডেল।

ডিমান্ড রেগুলেটর সহ দুই টিউবের একটা অ্যাকুয়ালাং, মাস্ক, বড় দুটো ফ্লিপার, দুইশো অ্যাটমসফিয়ার প্রেশারের দুটো বাতাস ভরা ট্যাঙ্ক–একটা ডোনা ডানের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার, অন্যটা ফেরার জন্য। কম্পাস, ক্যামেরা, ঘড়ি, ওয়েইট বেল্ট, ছুরি, ডাইভারের অন্যান্য টুল, একটা শক্তিশালী ট্র্যান্সমিটার–যা যা দরকার তার সবই আছে।

সঙ্গে করে ওয়ালথার পি.পি.কে. নিয়ে আসেনি ও। স্টিলেটোটাও নেই। ধরা পড়লে একজন বীচ খেউমার কাছে ওগুলো থাকার কোনও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা যাবে না। ওগুলো না এনে ভালই হয়েছে। তবে নিজেকে অরক্ষিত মনে হচ্ছে অস্ত্রগুলো সঙ্গে না থাকায়।

কম্পার্টমেন্ট থেকে ভয়ঙ্করদর্শন একটা ম্যাশেটি বের করে কিছুক্ষণ ওটার দিকে চেয়ে থাকল রানা। বিপজ্জনক একটা জিনিস, প্রায় কাটলাসের সমান দীর্ঘ। ফলার একদিক এতই তীক্ষ্ণধার যে এক কোপে মানুষের কল্লা নামিয়ে দেয়া যাবে।

একপাশে ম্যাশেটিটা নামিয়ে রাখল ও। আজকে একবার ভেবেছিল সৈকতে যাবার সময় ওটা সঙ্গে নেবে। পরে কি ভেবে নেয়নি। না নেয়াটা ভাল হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান খুনীটা সন্দেহ করে বসতে পারত। সেক্ষেত্রে সহজে তার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া মুশকিল হত। আপাতত কবীর চৌধুরীর আস্তানায় হানা দেয়ার কোনও ইচ্ছে ওর নেই। আগে ডোনা ডানের সঙ্গে দেখা করে সে কি তথ্য সাপ্লাই দিতে চায় তা জানতে হবে, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

প্লাস্টিকে মোড়া ছোট একটা চৌকো বাক্স বের করে সীটটা আবার নামিয়ে রাখল রানা। বাক্সটা ওর রাতের খাবার। বীন আর দুটো স্যান্ডউইচ। সঙ্গে করে স্কচ হুইস্কির ছোট দুটো বোতলও নিয়ে এসেছে ও। আস্তে ধীরে খাওয়া সারল রানা, খাওয়া শেষে হাত-মুখ ধুয়ে আরাম করে একটা সিগারেট ধরাল, কষে টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল। জানে ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রাস্তা থেকে ও এত দূরে আছে যে সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ কারও নাকে যাবার কথা নয়।

জঙ্গলের ভেতর আপাতত নিজেকে নিরাপদ মনে করছে ও। অনুভূতি ওকে সতর্ক করছে না। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। দৈত্যাকার পাহাড় আকৃতির মেঘগুলো দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। বাতাসের বেগও বেড়েছে। গাছের পাতায় শিরশিরে আওয়াজ তুলে বয়ে যাচ্ছে অবিরাম।

ঘুমানোর আগে গ্লাভ্‌স্ কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা কোঁচকানো রোড ম্যাপ বের করল ও। কাগজটার ভাঁজে পেঁয়াজের খোসার মত পাতলা কাগজে ছোট একটা চার্ট আছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় অনেকক্ষণ ধরে চার্টটা দেখল রানা, মাঝে মাঝে পেন্সিল দিয়ে মন্তব্য লিখল পাশে। কাজটা শেষ করে সীট নামিয়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজল, গায়ের ওপর টেনে নিল একটা নেভি ব্ল্যাঙ্কেট।

কালকের দিনটা অত্যন্ত ব্যস্ততায় কাটবে।

শতাব্দী পুরানো একটা স্প্যানিশ গ্যালিয়নের কাছে ডোনা ডানের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে ওকে। গ্যালিয়নটা সতেরোশো পনেরো সালে সবকয়জন নাবিক নিয়ে ডুবে যায়। মোনা প্যাসেজে ডুবেছিল ওটা, গ্যালোস কে থেকে তিন মাইল দূরে। দশ ফ্যাদম পানির নিচে পড়ে আছে। তার মানে ষাট ফুট নিচে।

ডোনা ডানের সঙ্গে দেখা করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাহাত খান। কারও চোখে

www.MurchOna.com

পড়া চলবে না। কিছুতেই যেন ডোনা ডানের কাভার নষ্ট না হয়। যদি মেয়েটার ভুলে কোনও বিপদ হয় তাহলে রানা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে না, সরে আসবে যত দ্রুত সম্ভব। হাসল রানা, রাহাত খান ভাল করেই জানেন পরিস্থিতি অমন হলে বসের নির্দেশ মানবে না ও।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে ম্যাশেটিটা কম্বলের নিচে দেহের পাশে রাখল ও। কালকে খোলা সাগরে যেতে হবে ভাবতেই আরেকটা চিন্তা মাথায় দোলা দিল। হারিকেন আসছে সেটা আগে জানা যায়নি। পরিস্থিতি খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। মন থেকে সমস্ত চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করল রানা, ঘুমিয়ে পড়তে দু'মিনিটও লাগল না ওর।

পরদিন দুপুর ঠিক দেড়টায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চারপাশটা ঘুরে দেখল রানা। কেউ ধারেকাছে আসেনি, জঙ্গলে অনুপ্রবেশের কোনও চিহ্ন নেই। প্রাণ বলতে আছে শুধু কিছু পাখি আর দূরবর্তী পাহাড়ের পাদদেশে ঘাসজমিতে চরে বেড়ানো কয়েকটা গরু। সারা সকাল ও ব্যয় করেছে প্রাচীন গাড়িটার কারবুরেটর, প্লাগ আর গ্যাস লাইন পরিষ্কার করে। দু'বার স্টার্ট দিয়ে দেখেছে, প্রবল আপত্তি জানালেও এখনও সচল আছে প্রাগৈতিহাসিক এঞ্জিন। আশা করা যায় গাড়িটা ওকে স্যান হুয়ানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তবে আজকে যদি কপাল মন্দ হয় তাহলে কোনওদিনই আর ফিরে যাবার কথা ভাবতে হবে না ওকে।

হাসল রানা, জীবনে কম ঝুঁকি তো নেয়নি ও। আজও বেঁচে আছে। একদিন ভাগ্যটা হয়তো আর সহায়তা করবে না, অথবা এমন ভুল করবে যে বাঁচার আর উপায় থাকবে না। ভাগ্য মুখ ফিরিয়ে নেবে। সেদিনটা ওর জীবনের শেষ দিন। কিন্তু মরতে তো সবাইকেই হয়। মৃত্যুই জীবনের একমাত্র স্থির সত্য। আজকে যদি মরতে হয় তাহলেও পিছিয়ে যাবার কোনও অর্থ নেই। রানা জানে, এ পেশা ও স্বেচ্ছায় কোনওদিনই ছাড়তে পারবে না। নিরাপদ জীবন ওর জন্যে নয়। রহস্য রোমাঞ্চ আর বিপদ না থাকলে ওর মনের একটা বিরাট অংশ মরে যাবে।

জঙ্গলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল রানা, সোহানার কথা ভাবছে। সোহানা দূরে চলে গেছে। রূপাও তাই। যারাই ওর জীবনে এসেছে, হৃদয়ে ছাপ রাখতে পেরেছে, তাদের কেউ ওর জীবনে স্থায়ী অবস্থান করে নেয়নি। সুলতার কথা মনে পড়ল। ওই একটা মেয়ে ওকে সত্যি বেঁধে ফেলেছিল। তারপর রেবেকা...আরও কত মানুষ। কেউ বন্ধু, কেউ বান্ধবী, কেউ প্রেমিকা। কেউই বাঁধনে জড়িয়ে আটকে রাখতে পারেনি ওকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, একা পথ চলাই ওর কপালের লিখন, নিয়তি।

রাস্তার দিকে তাকাল। আজকে সামান্য ট্র্যাফিক আছে। পনেরো মিনিটে দুটো গাড়ি যেতে দেখল। এতক্ষণে রেডিওতে হারিকেনের পূর্বাভাষ প্রচারিত হয়ে যাবার কথা। ট্যুরিস্টরা হোটেলের ধারকাছ থেকে নড়বে না। আদিবাসীরা দরজা জানালা বোর্ড দিয়ে আটকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাবে।

দুটোর সময় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল ও, সড়ক পার হয়ে সৈকতে চলে এল। সাগরের শান্ত পানি দেখে বোঝা যায় না ভয়ঙ্কর হারিকেন আসন্ন। তবে মোনা প্যাসেজের পানির রং বদলে গেছে। আকাশও তার রং পাল্টেছে। সব এখন গাঢ় ধূসর। কালো মেঘের আড়ালে সূর্যটা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছে, কোথায় আছে বোঝা যাচ্ছে না। কালকের চেয়ে বাতাস বেড়েছে, সৈকতের জায়গায় জায়গায় পাক খেয়ে উড়ছে ধুলোর ঘূর্ণি। কোকো পামগুলোর মাথা বার বার নুইয়ে দিচ্ছে দমকা বাতাস।

রানার হাতে ছোটখাট টর্পেডোর মত গোল একটা জিনিস, লম্বায় তিন ফুট আর ব্যাস এক ফুট। এক মাথায় ধরার জন্যে দুটো গ্রিপ আছে, অন্যমাথায় ছোট একটা প্রপেলার। জিনিসটা আসলে টর্পেডোর ঠিক উল্টো বলা চলে। ওজন ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার বদলে এটা ওজন টেনে নিয়ে যায়। ব্যাটারিচালিত। খুদে সী স্কুটারটা গাড়ির তলায় স্ক্রু দিয়ে আটকানো ছিল। এটার সাহায্য নিয়ে ডুবে যাওয়া এল কংকুইসটেডরের ধ্বংসাবশেষের কাছে পৌঁছোতে চায় রানা। শক্তি ব্যয় করতে ও রাজি নয়, ওখানে যেকোন ধরনের বিপদ মোকাবিলা করার জন্যে শারীরিক ভাবে সম্পূর্ণ ফিট থাকা প্রয়োজন।

অল্প পানি ভেঙে গভীর পানিতে চলে এল রানা, ডুব দেয়ার পর মোটামুটি নিশ্চিন্ত বোধ করল। স্কুবা ডাইভারের পোশাক পরা অবস্থায় কারও চোখে পড়ে গেলে তার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

চার্টটা স্মৃতিতে গেঁথে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে রানা। এখন কম্পাসের ওপর চোখ রেখে এগিয়ে চলেছে পানির তলা দিয়ে। সাগরের এক মাইল বা তার কিছু বেশি দূরে ডুবেছিল এল কংকুইসটেডর, পশ্চিম দিক থেকে বড়জোর এক পয়েন্ট উত্তরে। বোতামে চাপ দিয়ে সী স্কুটারের প্রপেলার চালু করল রানা, স্কুটারের হ্যান্ডেল শক্ত করে ধরে রেখেছে। পানির দশ ফুট নিচ দিয়ে ওকে টেনে নিয়ে চলল স্কুটার। যতক্ষণ সম্ভব কম গভীরতায় থাকতে চাইছে ও বাতাস বাঁচানোর জন্যে। তারপরও গন্তব্যে পৌঁছোনোর পর সিলিন্ডারে খুব বেশি বাতাস থাকবে না। ফিরে আসার সময় সম্ভবত রিজার্ভ বাতাসের ওপর নির্ভর করতে হবে ওকে।

খুব সামান্য পানিই আলোড়িত করছে স্কুটারের প্রপেলার, তবুও মাছের দল আকৃষ্ট হলো। বিরাট একটা গ্রুপার ওর পেছন পেছন আসতে শুরু করল। কোরালের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় রং বদল করে ছদ্মবেশ ধরল ওটা। রামধনুর মত সাতরঙা ছোট মাছের ঝাঁকের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছে রানা। ওকে এগোতে দেখে লাল নীল হলুদ সবুজ কমলা বেগুনী নানা রঙের ঝিলিক তুলে ছিটকে সরে পথ করে দিচ্ছে মাছগুলো।

দশ মিনিট পর চারটে দীর্ঘ ছায়া নজর কাড়ল ওর। একটু লক্ষ করতেই বুঝতে পারল ওগুলো কি। ব্যারাকুডা! একসঙ্গে চারটে। অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার। সবকিছুতে নাক গলানো ব্যারাকুডার বদ-অভ্যেস, কৌতূহল মেটার আগে পর্যন্ত পিছ ছাড়বে না ওগুলো। দেখতে যতটা কুৎসিত আসলে ততটা হিংস্র নয় ব্যারাকুডা। আপাতত বিপদের আশঙ্কা করছে না রানা। তবে নিশ্চিন্তও বোধ

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

করতে পারছে না। গ্রুপারটাকে যদি ব্যারাকুডাগুলো আক্রমণ করে বসে তাহলে পানিতে রক্ত ছড়িয়ে পড়বে। এদিকের সাগরে রক্ত মানেই হাঙরের আগমন। নাগালের মধ্যে যা পাবে সেটাই আক্রমণ করবে হাঙরের পাল।

একটানা এগিয়ে চলেছে রানা। সঙ্গীদের চেয়ে সাহসী একটা ব্যারাকুডা ওর পাশে চলে এল, অ্যালিগেটরের মত চোয়াল খুলে বন্ধ করে চোখ ঘুরিয়ে দেখল রানাকে, এগিয়ে চলেছে সমান গতিতে। ওটার সুচের মত তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি স্পষ্ট দেখতে পেল রানা, পাত্তা দিল না, তবে ছুরিটা খাপ থেকে বের করে ডানহাতে ধরে রাখল। বিড়বিড় করে বলল, 'চলে যা, আমি তোকে বিরক্ত করছি না, তুইও করিস না।' বুঝতে পারছে চারটে মাছ যদি একসঙ্গে হামলা করে বসে তাহলে এই ছুরি দিয়ে কিছুই করতে পারবে না ও।

গভীরতা বাড়িয়ে ব্যারাকুডাগুলোকে খসানোর চেষ্টা করল রানা, কোরালের মাঝ দিয়ে একটা ক্যানিয়ন ধরে এগোল, চোখ কম্পাসের ওপর। ক্যানিয়ন থেকে যখন বের হলো তখন গ্রুপারটা চলে গেছে, ছোট মাছগুলোও নেই, কিন্তু ব্যারাকুডার দল ঠিকই অনুসরণ করছে পঞ্চাশ গজ দূর থেকে। ভাব দেখে মনে হলো না ওগুলোর কোনও বদ মতলব আছে।

বড় মাছের শিকার কোনও ছোট মাছ রানার চোখে পড়ল না। একটাও টারপন, বনিটো বা ঘুক নেই, অথচ মোনা প্যাসেজে ওগুলোর ভিড় থাকার কথা। ওপরের সাগর অশান্ত হলেও নিচে পানি একেবারেই শান্ত, কাঁচের মত পরিষ্কার। বাতাস কম খরচ করার জন্যে আবার দশ ফুট গভীরতায় ফিরে এলো রানা, আরেকটু হলেই একটা স্টিং রে'র সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেত। ওড়ার ভঙ্গিতে দ্রুত গতিতে চলে গেল ওটা। কোরালের একটা ঘন ঝাড় সামনে পড়ায় দিক বদলাতে হলো রানাকে। ওটার গায়ে সী ফ্যান আর স্পঞ্জ জন্মেছে। ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোল রানা। মাস্কের ভেতর খানিকটা পানি ঢুকে পড়ায় সামনেটা ভাল দেখা যাচ্ছে না। চিৎ হয়ে জোরে জোরে শ্বাস ফেলে পানিটুকু বের করে দিল ও। আবার যখন পেছনে তাকাল, দেখল এখন মাত্র দুটো ব্যারাকুডা ওকে অনুসরণ করছে। কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করল রানা।

ডোনা ডানের দেয়া তথ্য অনুযায়ী এল কংকুইসটেডর আর বেশি দূরে নেই। চায়ের পেয়ালা আকৃতির একটা বেসিনের মাঝখানে শুয়ে আছে জাহাজটা। রীফের কারণে মাত্র ষাট ফুট গভীরে ডুবেছে। পেয়ালার মাঝখানে থাকার কারণেই সম্ভবত এতদিন পরেও ওটার কাঠের তৈরি খোল মোটামুটি অক্ষত।

খুব বেশি কিছু আশা করছে না রানা, ওটাকে জাহাজ হিসেবে চেনা সহজ হবে বলেও ভাবছে না। শত বছরের ঝড়, সামুদ্রিক আগাছা আর পোকা এতদিনে তাদের ছাপ রেখেছে নিশ্চয়ই। খোলের আবছা একটা আকৃতি থাকবে বড়জোর, হয়তো থাকবে দুয়েকটা প্রবাল ছাওয়া কামান, এর বেশি কিছু নয়। তাতে রানার কিছু আসে যায় না, ও এখানে সোনা ভরা স্প্যানিশ গ্যালিয়নের খোঁজে আসেনি, এসেছে ডোনা ডানের সঙ্গে দেখা করতে। ডোনা ডান একটা নোট বই দেবে ওকে। তাতে লেখা থাকার কথা বাংলাদেশী তেল বিক্রির দুই বিলিয়ন ডলার সোনার হদিস। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে তারপর।

বারবার কম্পাস আর ঘড়ি দেখছে রানা। সামনে খুব কাছেই কোথাও আছে জাহাজটা। একবার পেছনে ফিরে তাকাল, এখনও অনুসরণ করছে ব্যারাকুডা দুটো। সামনে মুখ ফেরাতেই দেখতে পেল এল কংকুইসটেডরকে। ওর ঠিক নিচেই কোরালের মাঝ থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কাঠের একটা মাস্তুল। ও যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক ভাল অবস্থায় আছে জাহাজটা। ওটার বো আর বুলওয়ার্ক দেখতে পেল। পেছনে যেখানে মিযেন থাকার কথা সেখানে এখনও অক্ষত আছে পূপ কেবিন। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। খুবই অস্বাভাবিক। জাহাজের ডেক এবং অন্যান্য অংশ ঢাকা পড়েছে সাদা বালিতে।

আরও নিচে নেমে জাহাজটা পরীক্ষা করার আগে পাঁচ ফুট গভীরতায় উঠে এলো রানা, কোনও নৌকোর তলদেশের ছায়া আছে কিনা দেখতে চায়। ডোনা ডান নিশ্চয়ই গ্যালোস কে থেকে তিন মাইল সাঁতরে আসবে না। নৌকোর চিহ্নমাত্র নেই। ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। রঁদিভুর আরও পনেরো মিনিট বাকি আছে। এল কংকুইসটাডরের কঙ্কালের কাছে নেমে এলো রানা, আরেকবার পেছন ফিরে তাকাল। ব্যারাকুডা দুটো এখনও আছে, ছয়ফুট লম্বা, সাপের মত কিলবিলে দেহ। বারবার চোয়াল খুলে বন্ধ করে ক্ষুরের মত দাঁতগুলো কিড়মিড় করছে। ডোনা ডানকে পানিতে হঠাৎ করে নামতে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে আক্রমণ না করে বসে ব্যাটারা। হামলা করলে মহিলাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে ওকে। আর তার মানেই রক্ত। একবার এদিকের সাগরে রক্তের গন্ধ পেলে দলে দলে হাজির হবে ক্ষুধার্ত হাঙর। ভাবনাটা রানার পছন্দ হলো না।

নিজের ওপর বিরক্ত হলো রানা, পানির নিচে ডুবুরিদের প্রায়ই মানসিক চাপের মুখোমুখি হতে হয়। ওর সেটা জানা আছে, অথচ অপেক্ষা করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই নার্ভাস হয়ে পড়ছে। মিশন সফল করতে হলে এধরনের অস্থিরতা মোটেই কাম্য নয়।

স্কুটারটার মটর বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাটারি শেষ। বড় বড় ফ্লিপারগুলো নেড়ে ষাট ফুট গভীরে ডুবন্ত জাহাজের ধ্বংসাবশেষের কাছে চলে এলো রানা, টের পেল কানের পর্দার ওপর পানির চাপ বেড়ে গেছে। সতেরোশো পনেরো সাল থেকে টিকে আছে পূপ কেবিন, স্টার্ন পার হয়ে সরাসরি সেটার দিকে এগোল। কাছে যেতেই বুঝতে পারল পূপ কেবিনটা টিকে থাকা মোটেই অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা নয়, পানির তলায় যত্ন করে কেউ একজন মেরামত করেছে ওটা।

পূপ কেবিন আর জাহাজের ডেকের প্রতিটা কোনা স্টীলের বার দিয়ে মজবুত করা হয়েছে। কিছু কিছু প্ল্যাঙ্ক আর বোর্ড আসল নয়, অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, কাঠের রং করা। লম্বা লম্বা স্টীলের বীম সাগরের গভীরে পুঁতে কেবিনটাকে ঠেকা দেয়া হয়েছে যাতে ধসে না পড়ে। চারপাশে তাকিয়ে ভাল করে দেখল রানা। একটা রীফের ওপরে গামলা মত জায়গায় বসে আছে জাহাজটা। প্রাকৃতিক ভাবেই কিছুটা রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু আসলে এখনও টিকে আছে শুধু স্টীলের বীমগুলোর কারণে। মাস্কের তলায় ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। ডোনা ডান হয়তো

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike
www.MurchOna.com

জাহাজটার ব্যাপারে কিছু জানাবে ওকে। ব্রীফিং ছাড়াই বলতে গেলে আসতে হয়েছে ওকে, কাজেই রওনা হবার কিছু আগে জাহাজটার কথা শুনেছে। এব্যাপারে ওকে কিছু জানানো হয়নি।

পূপ কেবিন যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে হাজির হলো রানা। কিছু নেই। দশ ফুট নিচে কাদার নিচে চাপা পড়েছে হাল্কের আকৃতি। পুরানো কামান গোলাকার মুখটা হাঁ করে চেয়ে আছে ওর দিকে। এবড়োখেবড়ো একটা গোলক দেখতে পেল, পড়ে আছে কামানের পাশে। এক সময় ওটা বোধহয় কামানের গোলা ছিল।

পূপ কেবিনটাকে শক্ত করে ধরে রাখা স্টীলের বীমগুলো পরখ করে দেখল রানা। ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় দেখল বীমের গায়ে খোদাই করা আছে, কে. বি. দুই হাজার দুই।

কবীর চৌধুরী?

পাগল বিজ্ঞানী বা অন্য কেউ কেন এল কংকুইসটেডরের মত একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ সংস্কার করবে সেটা ওর মাথায় ঢুকল না।

সিনেমা? কোনও সিনেমার শূটিং করা হয়েছে এখানে? না। তেমন কিছু হলে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস ওকে জানাত।

এবার স্টীলের দরজাটা দেখতে পেল রানা। প্রকাণ্ড একটা দরজা, আধখোলা। নতুন তৈরি। সামনে বেড়ে রানা দেখল ভারী দরজাটাকে ধরে রাখার জন্যে স্টীল দিয়ে নতুন একটা আকৃতি দাঁড় করানো হয়েছে। মোটা একটা অব্যবহৃত শেকল আর তালা ঝুলছে দরজার একটা কড়ায়। অন্ধকার কেবিনের ভেতর ঢুকে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালল রানা, মনে মনে ভাবছে এখন একটা অক্টোপাস বা জায়ান্ট স্কুইড ভেতরে থাকলে ষোলো কলা পূর্ণ হয়।

কিছুই নেই কেবিনের ভেতরে। ষোলো ফুট বাই ষোলো ফুট আকৃতির ফাঁকা কেবিন খাঁ-খাঁ করছে। কেবিনের ভেতর একটা চক্কর মারল রানা। কেবিনটা স্টীলের বার দিয়ে ভেতর থেকেও মজবুত করা হয়েছে। ভ্রূর কুঞ্চন আরও বাড়ল রানার। এতকিছু যে করেছে সে কেবিনটা খালি ফেলে রেখেছে কেন? মূল্যবান কিছু নিশ্চয়ই ছিল এখানে, অথবা মূল্যবান কিছু রাখার জন্যে জায়গাটাকে ব্যবহার করা হবে।

কেবিন থেকে বেরিয়ে ওপরে তাকাতেই রানা বুঝতে পারল এখন আর ও একা নয়, মহিলা স্লীপার এজেন্ট হাজির হয়েছে। ছোট একটা ক্যাটাম্যারানের জোড়া খোল দেখা যাচ্ছে ছায়া ছায়া মত, দুলছে ঢেউয়ের দোলায়। কাজটা দ্রুত সেরে নিতে চাইছে রানা, মন বলছে এখানে বেশিক্ষণ থাকা মোটেই নিরাপদ হবে না। মহিলা এখনও পানিতে নামেনি। ব্যারাকুডা দুটোকে দেখতে পেল রানা, চুপচাপ ওকে লক্ষ করছে, প্রায় অনড়, শুধু মাঝে মাঝে ফিনগুলো নাড়ছে।

সাগরে নেমেছে ডোনা ডান, তাকে ঘিরে রুপোলি বুদ্বুদ ঘুরপাক খেয়ে ওপরের দিকে উঠছে। অপেক্ষা করছে রানা, খেয়াল করল মেয়েটা মাত্র একটা বাতাসের ট্যাঙ্ক নিয়ে নেমেছে। বেশিক্ষণ তার পানির নিচে থাকার ইচ্ছে নেই, রানার হাতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েই ফিরে যাবে।

রানাকে দেখতে পেয়েছে ডোনা ডান, সাবলীল গতিতে এগিয়ে আসছে। দ্রুত নড়ছে সুগঠিত পা দুটো। পানির তলায় দেখে মনে হচ্ছে বাতাসে উড়ছে তার দীর্ঘ সোনালী চুল। একটা বিকিনি পরনে, তাতে যৌবনের উচ্ছ্বাস মোটেও ঢাকা থাকেনি। সরু কোমর, সুউন্নত বুক, মাস্কের কারণে চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না, তবে খায়রুল কবীরের রুচির ওপর আস্থা আছে রানার। প্রেমিকা হিসেবে বেছে নিয়েছে যখন, মেয়েটা অপূর্ব সুন্দরীই হবে।

নিজের ওপর বিরক্ত বোধ করল রানা, এখানে ও মেয়েটার সৌন্দর্য বিচার করতে আসেনি।

রানার গভীরতায় নেমে এসে মুখোমুখি হলো ডোনা ডান, মাস্কের মাঝ দিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। মেয়েটার এক হাতে ছোট একটা বর্শা, অন্য হাতে ওয়াটারপ্রূফিঙে মোড়া বই মত কি যেন একটা। পানিতে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকল ডোনা ডান। বুকে তিনবার টোকা দিয়ে জবাব দিল রানা, তারপর ঘড়ি দেখাল। দ্রুত শেষ হয়ে আসছে ওর প্রথম সিলিন্ডারের বাতাস।

বুঝতে পেরেছে, আস্তে করে মাথা দোলাল ডোনা ডান, আরও এগিয়ে এসে ওয়াটারপ্রূফিঙে মোড়া জিনিসটা রানার হাতে দিল। ওটা ট্রাঙ্কের ভেতর গুঁজে রাখল রানা।

এবার হাতের বর্শাটা দিয়ে ওপরে খোঁচা মারার ভঙ্গি করল ডোনা ডান। কি যেন বলতে চাইছে মেয়েটা, মাস্কের ভেতর দিয়ে দাঁত দেখা গেল। বারবার মুখ নেড়ে ইশারা করছে।

মাথা নাড়ল রানা, বুঝতে পারছে না। অধৈর্য হয়ে উঠেছে ডোনা, বর্শাটা ওপরে তুলে কি যেন বলছে, বোঝা যাচ্ছে না কিছু। আবার মাথা নাড়ল রানা, ঘড়ির দিকে ইশারা করল। যতটা সময় থাকার কথা ছিল তার চেয়ে বেশিই এখানে থেকেছে ও, এবার রওনা হতে হবে।

আসলেই দেরি হয়ে গেছে। পানির সামান্য ওপরে এসে থেমেছে একটা ছোট হেলিকপ্টার, ওটার রোটরের বাতাসের ঝাপটায় ওপরের অশান্ত পানি আরও অশান্ত হয়ে উঠল। ঝপ করে নামল একজন ফ্রগম্যান, সোজা ওদের দিকে আসছে।

প্রমাদ গুনল রানা, নিরস্ত্র অবস্থায় কিছুই করার নেই ওর। একটা স্টীলের বীমে হাত রেখে লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখছে ডোনা বিস্ফারিত চোখে। মনে হলো ভয়ে অবশ হয়ে গেছে মেয়েটা, অবশ্য সামলে উঠল দ্রুত, হাতের ইশারায় রানার কাছে দেয়া বইটা দেখিয়ে বার বার হাত নাড়ল, রানাকে সরে যেতে বলছে।

পায়ের সঙ্গে আটকানো খাপ থেকে ছোরাটা টেনে বের করল রানা, ডোনা ডানের সামনে এসে তাকে আড়াল করে দাঁড়াল। ইশারা করল পূপ কেবিনটার দিকে, ডোনা ডান বুঝতে পারল না। বর্শাটা সামনে বাগিয়ে ধরেছে আত্মরক্ষার

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike
www.MurchOna.com

জন্যে।

ফ্লিপার নেড়ে দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে আসছে কালো রাবারের সুট পরা ফ্রগম্যান। অনেক দেরিতে দেখল রানা লোকটার হাতের স্পিয়ার গান। মাস্কের তলায় খুনের আনন্দে জ্বলজ্বল করছে তার চোখ।

ছয়ফুট দূরে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ট্রিগারে চাপ দিল সে। নিঃশব্দে পানি কেটে ছুটে এলো শক্তিশালী সি ও টু। ঠিক সে মুহূর্তে ডোনা ডান শরীর মুচড়ে চলে এলো রানার সামনে। বর্শাটা বাম বুকে গাঁথল তার, পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল ফলা।

পানিতে পাক খেয়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল তাজা রক্ত, আস্তে আস্তে মিশে যাচ্ছে নীল পানির সঙ্গে। মৃত্যু যন্ত্রণায় মাস্কটা টান দিয়ে খুলে ফেলল ডোনা, চকিতে রানা দেখতে পেল অপূর্ব সুন্দর চেহারাটা। কিছুই করার নেই ওর, মেয়েটা মরে যাচ্ছে চোখের সামনে। ডোনার অবশ হাত থেকে বর্শাটা নিল রানা, ডোনার কথা আর ভাবছে না। দ্রুত কিছু একটা করতে হবে, ভাগ্যও ভাল থাকতে হবে, নইলে শীঘ্রি ডোনা ডানের পরিণতি হবে ওরও।

পেছনে হটে গেছে ফ্রগম্যান, রিলোড করে নিয়ে আবার সামনে বাড়ল। সাবলীল গতি দেখে মনে হলো কালো একটা হাঙর। স্পিয়ার গানটা এবার দু'হাতে ধরেছে লোকটা, যাতে কোনমতেই মিস না হয়।

মারা গেছে ডোনা ডান, কিন্তু রানাকে বাঁচাতে এখনও ভূমিকা রাখতে পারবে। যুবতীর পেছনে সরে এলো রানা, গায়ের জোরে মেয়েটাকে ফ্রগম্যানের দিকে ঠেলল। দেরিতে ট্রিগার টেনেছে ফ্রগম্যান, বুদ্বুদ তুলে ছুটে এলো বর্শাটা, ঘ্যাঁচ করে বিঁধল ডোনার পেটে।

রক্তের গন্ধে যদি নাও হয় তবু স্পিয়ার গানের শকওয়েভের কারণে শীঘ্রি হাজির হবে হাঙরের দল।

রানাকে পাশ কাটাল ফ্রগম্যান, রিলোড করছে স্পিয়ার গান। বর্শা হাতে তাকে অনুসরণ করল রানা, সমস্ত শক্তি দিয়ে পা নাড়ছে গতি বাড়ানোর জন্যে। হাতের কাছে পেয়ে লোকটার একটা ফ্লিপার আঁকড়ে ধরল। রানা কাছে চলে এসেছে বুঝতে পেরেই স্পিয়ার গানটা রিলোড করার চেষ্টা বাদ দিল ফ্রগম্যান, হাত থেকে পিস্তলটা ফেলে দিয়ে এক টানে কোমরের বেল্ট থেকে বের করে আনল একটা চকচকে ধারাল ছোরা, ঘুরতে চেষ্টা করল, রানার মুখোমুখি হতে চায়। টান দিয়ে তার দুটো ফ্লিপারই খুলে নিল রানা, ভারসাম্য হারানো লোকটার আরও কাছে যেতে চেষ্টা করছে। ছোরা চালাল ফ্রগম্যান, কাঁধে ইস্পাতের স্পর্শ পেল রানা, হাতের ঝাপটায় নিচে নামল, বর্শাটা বিঁধিয়ে দিল ফ্রগম্যানের পাঁজরের হাড়ের নিচে। হাতের চাপ বাড়াল। পড়পড় করে মাংসের ভেতর ঢুকছে চোখা ফলাটা। চাপ আরও বাড়াল রানা, পিঠ দিয়ে বের হলো বর্শার ফলা।

পিঠ আর বুক, দু'দিক থেকে রক্ত বের হচ্ছে ফ্রগম্যানের, মিশে যাচ্ছে পানির সঙ্গে। শরীর মোচড়াল লোকটা, দু'হাতে বুক খামচে বর্শাটা বের করার চেষ্টা করল। চোখের কোণে দেখতে পেল রানা, ব্যারাকুডা দুটো দশ ফুট দূরত্বে চলে এসেছে, চোয়াল খুলছে বারবার, উত্তেজনায় ঘনঘন নাড়ছে ডর্সাল ফিন।

পরিষ্কার পানিতে সরে যাওয়া দরকার। পূপ কেবিনের দিকে এগোল রানা। ডোনা ডানের দেহটা হাতের কাছে ভাসতে দেখে চিবুক ধরে সঙ্গে নিয়ে চলল। ফ্রগম্যানও বাদ গেল না। দুটো দেহই কেবিনের ভেতর ঢোকাল রানা, আলো জ্বালল। কেবিনের ভেতরে ভুতুড়ে লাগল দুই ব্যাটারির টর্চের আলো। মাস্ক খুলে দ্রুত হাতে ফ্রগম্যানের ছবি তুলে নিল ও, কাজটা সেরে বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে। ধক করে উঠল ওর বুকটা। হাঙরের দল হাজির হয়েছে।

প্রথম দর্শনে ছয়টা গুনল রানা, ওর বাতাসের ট্যাঙ্ক খালি হয়ে গেছে, রিজার্ভের সুইচ অন করল। শীঘ্রি এই কসাইখানা থেকে সরে পড়তে হবে ওকে।

ব্যারাকুডাগুলো হাঙর আসায় চটে গেছে, হঠাৎ করেই একটা হাঙরকে আক্রমণ করে বসল দুটো মিলে। দশ ফুট একটা টাইগার শার্ক যোগ দিল তাদের সঙ্গে, ব্যারাকুডা দুটোকে আক্রমণ করল। এল কংকুইসটেডরের চারপাশের পানি খয়েরী হয়ে উঠছে।

ওপরের দিকে তাকাল রানা। হেলিকপ্টারের ছায়াটা দূরে সরে যাচ্ছে। পানির ওপরে সেই আলোড়নও নেই। পাইলট বোধহয় রক্ত দেখে সাহায্য আনতে গেছে। কাছেই গ্যালোস কে। ওখানে কবীর চৌধুরীর লোক থাকবে। হাতে আর সময় নেই।

একটা স্টীল বীমের পাশে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখল রানা। চারটে হাঙর লড়াইতে অংশ নেয়নি। ওগুলো পূপ কেবিনের দরজার কাছে ভাসতে থাকা অদ্ভুত খাবারের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। পনেরো ফুট দীর্ঘ একটা হ্যামারহেড রানাকে পাশ কাটিয়ে কেবিনের দরজার কাছে থেমে দাঁড়াল, তারপর কি ভেবে সরে গেল দূরে। বাকি তিনটে রানাকে ঘিরে চক্কর মারছে।

রানার প্রথম ট্যাঙ্কের রিজার্ভ শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ট্যাঙ্কের সুইচ অন করল ও। ভাবছে কি করবে। পূপ কেবিনের ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলে বাতাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, তবে এটা স্থায়ী কোনও সমাধান হলো না। একটু পরেই আরও লোক নিয়ে ফিরে আসবে হেলিকপ্টার। এবার হয়তো সঙ্গে কোনও বোটও আসবে। ওকে খুন করতে চেষ্টা করতে হবে না ওদের, কেবিনের বাইরে অপেক্ষা করলেই চলবে, বাতাস শেষ হয়ে গেলে এমনিতেই দম আটকে মারা যাবে ও।

ডোনা ডানের দেহটা কেবিনের দরজার কাছে চলে এসেছে। ওটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল রানা কি করতে হবে ওকে। ফিরে চলল ও কেবিনের দিকে। ফ্রগম্যান আর ডোনার দেহ দুটো ঠেলে দিল বাইরে। ওকে পাশ কাটাল একটা ব্যারাকুডার অর্ধেক শরীর। অন্যটা এখনও টাইগার শার্কের সঙ্গে লড়ছে। ওগুলোকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে অন্য হাঙরগুলো, হেরে যাওয়া যোদ্ধার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। অর্ধেক ব্যারাকুডার দেহের দিকে এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে ছুটে এলো একটা হ্যামারহেড। খোলা চোয়ালের ভেতর ছয় সারি ক্ষুরধার দাঁত পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। পিঠের কাছটা শিরশির করে উঠল ভয়ে। শিকারের

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike
www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

গায়ে কামড় বসানোর সময় বিদঘুটে আওয়াজ করছে হাঙরগুলো। অস্পষ্ট, ভোঁতা আর হিংস্র।

কেবিন থেকে বেরিয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা। একবার কম্পাসের দিকে তাকাল। দক্ষিণ দিকে চলেছে। যেকোন সময় সার্চ শুরু হতে পারে। স্কুবা ডাইভারের খবর পৌঁছে গেছে ওদের কাছে। ওরা জানবে কতটা বাতাস আছে ওর। ধরে নেবে সবচেয়ে কাছের উপকূলের দিকে যাবে ও। কাছের তীর আর এক মাইল দূরে।

একশো গজ সরে আসার আগে পেছনে তাকাতে সাহস পেল না ও। তারপর তাকাল যখন, দেখল কংকুইসটেডরের কাছে লাল-খয়েরী ফেনা ঘুরপাক খাচ্ছে হাঙরগুলোর তাণ্ডবে। ফোঁস করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। হাঙর অনুসরণ করেনি ওকে।

আধ মাইল দূরে সরে এলো রানা। এখনও কোনও হাঙর আসছে না ওকে অনুসরণ করে। কবীর চৌধুরীর লোক এখনও পানিতে নামেনি। তবে বিপদ শেষ হয়নি, বাতাস খরচ করে দক্ষিণ দিকে চলেছে ও, পশ্চিমে সরছে দুই পয়েন্ট। কাছের তীরের বদলে মোনা প্যাসেজে বেরিয়ে যাবার ইচ্ছে। লোকগুলো ভাববে ও পুবে যাবে। আন্দাজ করে নেবে ওর বাতাস বেশি নেই। সার্চ করলে জাহাজটার ধ্বংসাবশেষের পুবে সার্চ করে সময় নষ্ট করবে আগে। ওর লাশটা না পেলে তখন সার্চের পরিধি বাড়াবে। ততক্ষণে কপাল ভাল থাকলে ওদের আওতার বাইরে চলে যেতে পারবে রানা।

ডোনা ডানের চেহারাটা চোখের সামনে ভাসল রানার। মেয়েটা টেরও পায়নি কখন তার কাভার নষ্ট হয়ে গেছে। আজকে যা ঘটেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে ঠাণ্ডা আর বুদ্ধিমান মাথা কাজ করছে আড়াল থেকে। কবীর চোধুরী আর খায়রুল কবীর। নোট বইটা হাত দিয়ে স্পর্শ করল রানা। মারা যাবার আগে অনেক কিছু জেনেছিল ডোনা? নোট বইটাতে কি লেখা আছে তা না জানা পর্যন্ত কিছুই বোঝার উপায় নেই।

বাতাস শেষ হয়ে গেল রানার, রিজার্ভের সুইচ অন করল। এই গভীরতায় থাকলে আরও পাঁচ মিনিট অক্সিজেন পাবে ও। পাঁচ ফুট নিচ দিয়ে তীরের দিকে ঘুরপথে এগিয়ে চলেছে রানা। একটু পরই ওকে পানির ওপর মুখ জাগাতে হবে। ওপরে কি চলছে আল্লাহ মালুম। কবীর চৌধুরীর লোকদের সার্চের আওতার বাইরে চলে আসতে পেরেছে কিনা কে জানে।

রিজার্ভ বাতাস শেষ হয়ে যেতে বাক্‌ল্‌স্‌ ঢিল করে ট্যাঙ্কটা খুলে ফেলল রানা, ওয়েইট বেল্টও বাদ গেল না। ফেলে দিল হাতের বর্শাটা। মাস্কটা খুলল না। ওর ধারণা ঠিক হলে আরও বহুক্ষণ ওকে পানির নিচ দিয়ে সাঁতার কেটে এগোতে হবে।

খুব সাবধানে পানির ওপর সামান্য একটু মুখ তুলল ও, বুক ভরে টেনে নিল তাজা বাতাস। চোখ দুটো তীর খুঁজছে। সমুদ্র আগের চেয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছে। কিছুটা স্বস্তি পেল। সবুজ পানির ওপর প্রায়ই দেখা যাচ্ছে এখন সাদা ফেনা। হারিকেনটা এখনও অনেক দক্ষিণ-পুবে আছে, তবে আঙুল বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছে এদিকের সাগর।

হাল ছেড়ে দেয়নি কবীর চৌধুরীর লোকরা। হেলিকপ্টারটা দেখার আগেই ওটার আওয়াজ শুনতে পেল রানা। আধমাইল দক্ষিণ-পুবে সাগরের ওপর দিয়ে চক্কর মারছে। কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা, ঢেউয়ের দোলায় দুলছে চিত হয়ে। নির্দিষ্ট একটা ছক ধরে সার্চ করে চলেছে হেলিকপ্টার, সূর্যের একচিলতে আলোয় চিকচিক করছে রোটরব্লেডগুলো। রেফারেন্স রাখার জন্যে একটা মার্কার ফেলল সাগরে। দক্ষ লোক, সন্দেহ নেই কোনও।

হেলিকপ্টারের দিকে মনোযোগ এতই বেশি যে প্লেনের ডানার বাতাস কাটার চাপা হিসহিস আওয়াজটা অনেক দেরিতে শুনল রানা। ওটার এঞ্জিনটা অফ করে রাখা, বাতাসে গ্লাইড করছে। সার্চের পুরানো কৌশল, কিন্তু আরেকটু হলেই ধরা পড়ত রানা।

ছোট প্লেন, সম্ভবত সেসনা, অনেক ওপরে উঠে এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে গ্লাইড করে এগিয়ে আসছে পুব দিকে। এখন আর বেশি ওপরে নেই। আস্তে করে ডুবে গেল রানা, মনে মনে প্রশংসা করল, কেউ একজন ওরই মত করে ভেবেছে যে সরাসরি হয়তো তীরের দিকে যাবে না ও।

পানির সামান্য নিচে চিত হয়ে ঢেউয়ের দোলায় দুলছে রানা, ওর ঠিক মাথার ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল প্লেনটা। ওকে দেখতে পেয়েছে?

প্লেনের এঞ্জিনটা গর্জন ছেড়ে চালু হলো, আবার ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। নাক জাগাল রানা, উদগ্রীব হয়ে তাকাল প্লেনটার দিকে। ওটা যদি ফিরে আসে বা কোনও মার্কার ফেলে তার মানে বিপদে পড়ে গেছে ও।

সোজা পশ্চিম দিয়ে চলল প্লেন। স্বস্তির শ্বাস ফেলল রানা। ওকে ওরা দেখেনি।

দু'মিনিট চুপ করে ভাসল রানা, বিশ্রাম নিয়ে নিল, কম্পাস দেখে দিক ঠিক করল, তারপর রওনা হলো আবার। একবার কারও চোখে পড়লেই বিপদে পড়ে যাবে ও। তীর থেকে এত দূরে একা ওকে সাঁতার কাটতে দেখলে কবীর চৌধুরীর লোকদের বুঝতে অসুবিধে হবে না, যাকে তারা খুঁজছে ও-ই সে। সেক্ষেত্রে নিশ্চিন্তে গুলি করে মারা হবে ওকে, ওর কিছু করার থাকবে না।

সন্ধের আঁধার ঘনাতে শুরু করেছে। হেলিকপ্টারের গায়ে পড়া সূর্যের আলো বেশ কিছুক্ষণ আগেই উধাও হয়ে গেছে। সাগরটা ধূসর রং ধরেছে। আটলান্টিক আর ক্যারিবিয়ানের মাঝখানের মোনা প্যাসেজে এখন ঢেউ নেই বললেই চলে। স্রোত যা আছে সেটা রানাকে উত্তর দিকে ঠেলছে, বাড়িয়ে দিচ্ছে পরিশ্রম।

প্লেনটা আবার ফিরে এসেছে, রানার বেশ অনেকটা দক্ষিণে খুঁজছে ওকে। ডুব দিল রানা, বুঝতে পারছে জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে অন্তত তিন মাইল দক্ষিণে সরে এসেছে ও। স্রোতের কারণে পুয়ের্টো রিকোর তীর এখনও দু'তিন মাইল দূরে। ও জানে চেষ্টা করলে প্রায় পাঁচ মিনিট পানির নিচে ডুব দিয়ে থাকতে

www.MurchOna.com

পারবে। সেভাবে এগোনোই কম ঝুঁকিপূর্ণ। ঠিক করল, বারবার ডুব দিয়ে এগোবে ও, দম নিতে উঠবে ঠেকায় পড়লে।

ছোট প্লেনটা আবার ফিরে আসছে, এবার রানার আরও কাছাকাছি দিয়ে উড়ছে ওটা। নিচু মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে হেলিকপ্টার। আগের মত উঁচুতে নেই মেঘের দল। কোনও কোনও জায়গায় মেঘের কলাম নেমে এসেছে সাগরের গায়ে। দম নিতে উঠছে রানা, টের পাচ্ছে বাতাসের বেগ বেড়ে গেছে। ভেজা বাতাস বেশ গরম। দু'একদিন দেরি হবে হারিকেনটা আসতে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা, এমনিতেই সাধ্যের অতীত করতে হবে ওকে তীরে পৌঁছোতে হলে।

অর্ধেক পথ পেরোতেই একদল বনিটোর মাঝখানে পড়ে গেল রানা। হাজার হাজার মাছ, রানাকেও নিজেদের সঙ্গী মনে করেছে, ঠেলা ধাক্কা দিচ্ছে চারপাশ থেকে। ভেসে উঠল রানা, চারপাশে তাকাল। ডানদিকে মাইল খানেক দূরে কয়েকটা ফিশিং বোট মাছ ধরছে। একবার ভাবল সাঁতরে গিয়ে ওগুলোর একটাতে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিল। পরিশ্রম হয়তো অনেক কম হবে বোটে গিয়ে উঠলে, কিন্তু লোকের কৌতূহল হবে, মুখ খুলবে অনেকে, প্রকাশ হয়ে যাবে ওর উপস্থিতি। মিশনের স্বার্থে সেটা হতে দেয়া যায় না। তাছাড়া ওগুলো আসলেই জেলেদের বোট কিনা তাতেও সন্দেহের অবকাশ আছে। কবীর চৌধুরীর লোক হবার সম্ভাবনাই বেশি। আগুয়ান হারিকেনের মাঝে জেলেদের মাছ ধরতে বের হওয়ার কথা নয়।

আবার ডুব দিয়ে এগোল রানা, একটা ব্যাপারে স্বস্তি বোধ করছে। ও যখন তীরে পৌঁছোবে তখন এতই আঁধার হয়ে যাবে যে কোথায় উঠবে জানা না থাকলে সহজে ওকে স্পট করতে পারবে না কেউ।

তিন ঘণ্টা পর সৈকতে পৌঁছোল ও, শরীরে তখন শক্তি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ঢেউয়ের প্রান্ত ছাড়িয়ে শুয়ে পড়ল সৈকতে। শেষ এক ঘণ্টা ওর মনে হয়েছে কোনদিনই আর তীরে পৌঁছোনো হবে না। চিত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকাল। আরও নিচে নেমে আসছে ধূসর পাহাড় আকৃতির মেঘ। বাতাস এখনও নিচু সুরে হিসহিস আওয়াজ করছে, বালি ছিটিয়ে দিচ্ছে রানার গায়ে। ট্রাঙ্কের গায়ে হাত দিয়ে ওয়াটারপ্রুফিঙে মোড়া বই আকৃতির জিনিসটা স্পর্শ করল রানা। ডোনা ডান মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে জিনিসটা দিয়েছে ওকে। তথ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ না হলে ওর গতকাল এবং আজকের সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হয়ে যাবে।

পাঁচ মিনিট চুপচাপ বিশ্রাম নিল রানা, তারপর ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল যেখানে গাড়ি রেখেছে সেই জঙ্গলের দিকে। ততক্ষণে পরিপূর্ণ আঁধার নেমেছে। দূরে আলো দেখতে পেল, মিটমিট করছে। মায়াহুয়ারেজের আলো। ফ্লিপার খুলে ফেলল রানা, গাড়ির কাছে ফিরে যাবে কিনা আরেকবার ভাবল। ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়। নিশ্চিত হবার উপায় নেই গাড়িটার উপস্থিতি ওই অস্ট্রেলিয়ান হারামজাদার জানা হয়ে গিয়েছে কিনা। লোকটা যদি কারও কাছে রিপোর্ট করে তাহলে সেলোক হয়তো দুই আর দুই চার মিলিয়ে বসে আছে। সার্চ পার্টি পাঠিয়েছে হয়তো। গাড়িটা খুঁজে পেয়েও থাকতে পারে। ধারণা করে নেবে আজকের ঘটনার সঙ্গে সেই বীচ খেউমার যোগসাজশ আছে। সেক্ষেত্রে গাড়ির কাছে ফাঁদ পাতবে ওরা।

অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ান লোকটা তখন ওকে সন্দেহ করেনি, সাধারণ এক বীচ খেউমা ধরে নিয়ে মজা করেছে, কাজেই পরবর্তীতে তার সন্দেহ না হওয়ারই কথা। কৈফিয়ত দিতে হবে বলে মদ্যপ লোকটা হয়তো কর্তৃপক্ষকে রিপোর্টও করেনি। রানা এতই ক্লান্ত যে গাড়ির কাছে না ফেরার চিন্তাটা নানা যুক্তি বের করে বাতিল করে দিল। মায়াহুয়ারেজের আলোর দিকে আরেকবার তাকাল। অনেক দূরে শহরটা। তাছাড়া ওখানে সুইমিং সুট পরে গেলে খামোকা অনেক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। সোজা উত্তর দিকে এগোল রানা। ওদিকেই ঘন জঙ্গলের ভেতর গাড়িটা আছে।

দেড় ঘণ্টা লাগল গাড়ির কাছে পৌঁছোতে। বাদাম গাছ আর কোকো পামের সারি দেখে গাড়ির অবস্থান বুঝতে পারল রানা। সৈকতে কারও সঙ্গে দেখা হয়নি ওর। মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখেছে দুয়েকটা গাড়ি। প্রতিবার বালিতে শুয়ে পড়ে গাড়ির আলো এড়িয়ে গেছে ও।

সরাসরি না এগিয়ে ঘুর পথে জঙ্গলের দূরবর্তী প্রান্তে ঝোপের ভেতর থেকে নজর রাখল রানা, সন্দেহজনক কোনও কিছু চোখে না পড়ায় আধ ঘণ্টা পর গাড়ির কাছে এলো। বুড়ো গাড়ি নিথর দাঁড়িয়ে আছে, অন্ধকারের বুকে আরও কালো একটা আকৃতি। বাতাসের আওয়াজ ছাড়া চারপাশে আর কোনও শব্দ নেই।

পোশাক বদলে নিল রানা, স্কুবা নাইফটা ছাড়া আর সবকিছু গোল পাকিয়ে ফেলে দিল ডোবার জলে। ওয়াটারপ্রুফিঙে মোড়া বইটা ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় একবার পড়ে রেখে দিল গোপন কম্পার্টমেন্টে, ভ্রূ কুঁচকে গেছে।

ডোনা ডান যে তথ্য দিয়েছে তা অবাস্তব বলে মনে হয়। পুয়ের্টো রিকো সরকার হাইতির বিপ্লবীদের অস্ত্র চালান দেবে কু করার জন্যে। নিজ খরচায় তাদের সহায়তা দিচ্ছে কবীর চৌধুরী। আগামী কাল বা পরশু চীন থেকে রওনা হওয়া স্বর্ণবাহী জাহাজটা আসবে। ওটাতে অস্ত্র ছাড়াও দুই বিলিয়ন ডলারের সোনা থাকবে। বিপ্লব সফল হলে কবীর চৌধুরী হাইতিতেও একটা আস্তানা গাড়বে। পুয়ের্টো রিকোর মত ছোট দেশও হাইতির ওপর তাদের প্রভাব খাটাতে পারবে। পুয়ের্টো রিকোর সরকার এবং হাইতির ক্ষমতায় বসা বিপ্লবীরা সর্ব বিষয়ে কবীর চৌধুরীকে সাহায্য করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই পাঁচটা পিটি বোটে করে অস্ত্র নিয়ে হাইতির উদ্দেশে রওনা হবে কবীর চৌধুরী। খায়রুল কবীর তার সঙ্গে আছে। বাপ-ব্যাটা মিলে দক্ষিণ আমেরিকায় নিরাপদ আস্তানা তৈরি করে ল্যাবরেটরি করবে, সেই সঙ্গে একটা সংগঠন দাঁড় করাবে, স্মাগলিং থেকে শুরু করে ড্রাগের ব্যবসাও বাদ যাবে না তাদের সংগঠনের কার্যক্রমে। মাফিয়ার একটা বিকল্প শক্তি দক্ষিণ আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছে কবীর চৌধুরী। সেজন্যে নানা দেশ থেকে লোক সংগ্রহও হয়ে গিয়েছে। প্রাইভেট একটা আর্মি গড়ে তুলেছে কবীর চৌধুরী।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

গোপন কম্পার্টমেন্ট থেকে ট্র্যান্সমিটারটা বের করল রানা, অন করতেই খড়খড় আওয়াজ করতে শুরু করল যন্ত্রটা। একটু পরই ক্লিক করে একটা আওয়াজ হলো, পরমুহূর্তে কোমল একটা গলা জিজ্ঞেস করল, 'নেম প্লীজ?'

'এম আর নাইন।'

'চেকিং। ওয়েইট আ মিনিট। ওকে। গো অন।'

ডোনা ডানের দেয়া তথ্যগুলো সংক্ষেপে কোডেড মেসেজে জানিয়ে সহজ কোডে বাংলায় বলে গেল রানা। 'পাখিকে উড়তে হবে। নৌকোয় মাঝিমাল্লা ছাড়াও পাহারাদার থাকতে হবে। আসল মালবাহী নৌকো আগামী কাল বা পরশু ঘাটে ভিড়বে। আস্তানায় ঢুকতে যাচ্ছি, তবে পরে। আপাতত আর কিছু জানানোর নেই।'

পাখি অর্থাৎ সোহেলের এখন ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকার কথা। ওখানে এম ভি বাংলার গৌরব অপেক্ষা করছে। দেড়শো বাংলাদেশী সৈন্য থাকার কথা জাহাজটায়। চিনা জাহাজ আগামী কাল বা পরশুদিন সোনা নিয়ে আসছে। কবীর চৌধুরীর আস্তানায় ঢুকবে ও, তবে আপাতত নয়। আর কিছু জানানোর নেই।

'ওকে। গট ইট। ক্লিয়ারিং।' খুট করে একটা আওয়াজ হলো, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আবার খড়খড় শুরু করেছে ট্র্যান্সমিটার। সুইচটা অফ করে দিল রানা। কবীর চৌধুরীর এলাকায় ঢুকতে হলে আগে অস্ত্র দরকার। সেটা বিসিআই এজেন্টের কাছ থেকে যোগাড় করতে স্যান হুয়ানে যেতে হবে ওকে। কাল সন্ধের আগেই আবার ফিরতে হবে, নইলে কবীর চৌধুরী রওনা হয়ে যেতে পারে। হাতে একদম সময় নেই।

গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে না। তৃতীয়বার হ্যান্ডেলবার ঘোরানোর পর খকখক করে কেশে উঠে সচল হলো এঞ্জিন, বনেটটা থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। একমাত্র হেডলাইটটা জ্বেলে হাইওয়েতে উঠে এলো রানা, দক্ষিণ দিকে চলেছে। এই গাড়িতে করে স্যান হুয়ান পর্যন্ত পৌঁছোনো যাবে কিনা কে জানে, কিন্তু পন্স পর্যন্ত হয়তো এঞ্জিনটা ধকল সইতে পারবে। সেখান থেকে প্লেনে করে স্যান হুয়ানে যাওয়া যাবে। স্যান হুয়ানের একটা মিসাইল ট্র্যাকিং সিস্টেমে বিসিআইয়ের এজেন্ট অপেক্ষা করছে। তাকে জানিয়ে রাখতে হবে এদিকের খবর। দরকারে রানাকে সে সাহায্য করতে পারবে।

ক্যাঁচকোঁচ লক্কর-ঝক্কর নানান আওয়াজ তুলে ছুটে চলেছে গাড়িটা। একটা সিগারেট ধরাল রানা, ভ্রূ কুঁচকে ভাবছে। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখন আর বাংলার গৌরবে গিয়ে ওঠার সময় নেই। এখান থেকেই সোনার কাছাকাছি যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, তাকে বলবে জাহাজ নিয়ে আসতে। কবীর চৌধুরীর জাহাজটা আক্রমণ করে সোনা আর অস্ত্র কেড়ে নেয়া যাবে। সময় এবং সুযোগ হলে পিটি বোটগুলোও খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে হবে।

রাস্তার ধারের ঝোপ থেকে ছিটকে বের হলো উলঙ্গ মেয়েটা, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। সরাসরি গাড়িটার হেডলাইটের ক্ষীণ আলোর সামনে চলে এলো। দু'হাত তুলে থামতে ইশারা করছে। ব্রেক কষে গাড়ির গতি কমাল রানা। মেয়েটা বারবার পেছনে তাকাচ্ছে। এঞ্জিনের কোঁকানির ওপর দিয়ে মেয়েটার চিৎকার শুনতে পেল ও।

'হেল্প! হেল্প মি! প্লীইজ!'

গাড়িটা থামিয়ে ফেলেছে রানা, এঞ্জিনটা কেশে উঠে বন্ধ হয়ে গেল। মেয়েটা ছুটে আসছে, চেঁচাচ্ছে এক নাগাড়ে, তারস্বরে। গাড়ি থেকে নেমে আলোর কাছ থেকে সরে গেল রানা, অপেক্ষা করছে। কোনও ফাঁদ হলে সহজ টার্গেট হওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই।

মেয়েটার গায়ে কোনও কাপড় নেই। একটা মাত্র ছোট্ট প্যান্টি পরনে, ওটার কোনার দিকগুলো ছেঁড়া।

শরীর ঢাকার কোনও চেষ্টা করছে না মেয়েটা, দৌড়ে আসছে। রানার বুকের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুখের কোণে ফেনা উঠে গেছে দৌড়ে আসতে গিয়ে।

'প্লীইজ! প্লীইজ মিস্টার! আমাকে সাহায্য করো! ওরা আমাকে রেপ করতে চায়!'

তিন

একই সঙ্গে অনেকগুলো ভাবনা খেলে গেল রানার মাথায়। এসপিয়োনাজে উলঙ্গ মেয়ে ব্যবহার করে শত্রুকে থামিয়ে ফাঁদে ফেলা একটা অতি পুরোনো কৌশল। ফাঁদ এটা? লোকগুলো কোথায়? কয়জন ওরা? অস্ত্র ছাড়া ওর কি করার আছে?

মেয়েটাকে বুকের ওপর থেকে সরিয়ে আলোর পাশে বসিয়ে দিল রানা, সামনের অন্ধকারে তাকাল। হাতে বেরিয়ে এসেছে তীক্ষ্ণধার স্কুবা ছোরাটা। মনে মনে ভাবছে ম্যাশেটিটা এখন থাকলে কাজে দিত। আখ খেতের ধারে খচমচ আওয়াজ হচ্ছে। আঁধারে সামনে বাড়ল রানা, ছোরা বাগিয়ে রেখেছে। আন্দাজ করছে, ফাঁদ পাতা হয়েছে। কারা জড়িত তাদের দেখতে চায় ও, সম্ভব হলে তাদের আলাপ শুনতে চায়। আড়ালে থেকে কাছাকাছি পৌঁছোতে পারলে মেয়েটা সত্যি বলছে কিনা তা জানা যাবে সহজেই। যদি সত্যি না হয় তাহলে যেকোন সময় আক্রমণ শুরু হয়ে যেতে পারে।

সামনে থেকে কে যেন কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'হোসে? কোরা কই? কোরা?'

আরেকটা গলা ফিসফিস করল, 'পুলিস?'

সাহস করে কথা বলে উঠল রানা। 'পুলিস। থামো! গুলি করব এক্ষুণি!'

নিচু হয়ে একঝাড় জ্যাকারান্ডা ঝোপের ভেতর থামল রানা, অপেক্ষা করল।

www.MurchOna.com

আন্ডারব্রাশ ভেঙে এগিয়ে চলেছে কয়েকজন, আওয়াজটা শীঘ্রি দূরে সরে মিলিয়ে গেল। ফিরে চলল রানা গাড়ির দিকে, হাসছে মৃদু। ফাঁদ তাতে কোনও সন্দেহ নেই ওর, নইলে এত সহজে চলে যেত না লোকগুলো।

আস্তে ধীরে খেলবে ঠিক করেছে ও। ও বুঝেছে সেটা মেয়েটাকে বুঝতে দেয়া চলবে না। মেয়েটা ভাবতে থাকুক ও-ই রানাকে খেলিয়ে তুলছে। বীচ খেউমা হিসেবেই মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করবে, ঠিক করেছে ও। পরিচয়টা এখনও বজায় আছে কিনা সেটাও তাতে আঁচ করা যাবে।

যেখানে রেখে গেছে সেখানেই অপেক্ষা করছে মেয়েটা। এখনও সুউন্নত স্তন আর সুগঠিত ক্ষীণ কটি ঢাকার কোনও চেষ্টা নেই। দু'হাতে ছেঁড়া প্যান্টি ঢেকে রেখেছে।

রানাকে এগোতে দেখে একটু পিছিয়ে গেল মেয়েটা। অভিনয়টুকুর প্রশংসা করল রানা। যে কেউ ভাববে এ মেয়ে এমন এক অসহায় আতঙ্কিত যুবতী যাকে আরেকটু হলেই পৈশাচিক ধর্ষণের শিকার হতে হতো।

'ওরা চলে গেছে, সেনোর? ওদের তুমি ভাগিয়ে দিয়েছ?' ভাল ইংরেজি বলে মেয়েটা, যদিও পুয়ের্টো রিকোর টান স্পষ্ট।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা, কিছু বলছে না। আপাদমস্তক দেখল মেয়েটাকে। যথেষ্ট লম্বা মেয়েটা। কালো চুল কাঁধে লুটাচ্ছে। হঠাৎ করেই মেয়েটার কব্জি ধরে ফ্যাকাসে আলো ছড়ানো হেডলাইটের সামনে নিয়ে এলো রানা। নিজের অভিনয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ওর ভালই জানা আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে নারীলোভী এক সুবিধেবাদীর ভূমিকায় মোটামুটি উৎরে গেল। মেয়েটা ভাবুক ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে এসে পড়েছে।

মেয়েটা পেছনে সরার চেষ্টা করতেই হ্যাঁচকা টানে তাকে গায়ের কাছে নিয়ে এলো রানা। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজাল। ঠোঁট গোল করে মৃদু শিস দিয়ে বলল, 'ভয় কি, সোনা? আমি কি বাঘ না ভালুক? তোমাকে একটু দেখতে দাও। আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি, কি, বাঁচাইনি?'

কালো প্যান্টি থেকে হাত সরাল মেয়েটি, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কোরবানীর পশু কিনছে এমন ভঙ্গিতে তাকে দেখল রানা। 'আমরা কি এখান থেকে সরে যেতে পারি না, সেনোর?' জিজ্ঞেস করল যুবতী। 'আমাকে যারা রেপ করতে চেষ্টা করছিল তারা হয়তো ফিরে আসবে।'

হাসি চাপল রানা। বিপদের কোনও সম্ভাবনা নেই। ওরা দেখছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কিছু করবে না। ফাঁদটা সামনে কোথাও পাতা হয়েছে।

'একটু ভাল করে দেখে নিই, তারপর যাব,' বলল রানা। 'সেনোরিটা, নাকি সেনোরা তুমি, ডার্লিং?'

পান পাতার মত চেহারা মেয়েটার, ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক, দাঁতগুলো চকচকে সাদা, অমসৃণ। চোখ দুটোই মেয়েটার আসল সৌন্দর্য। বড় বড় চোখ, গভীর নীল। জ্বলজ্বলে চোখে রানাকে দেখছে।

'সেনোরিটা,' বলল মেয়েটা। 'সেনোরা হলে এই বাজে পরিস্থিতিতে পড়তে হতো না আমাকে। স্বামী থাকত সঙ্গে।'

ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা, দু'হাতে স্তন ঢাকল। মাথায় ঝাঁকি দিয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে রানার দিকে তাকাল। 'আমার ধারণা তুমি যথেষ্ট দেখেছ, সেনোর। অনেক বেশিই দেখেছ। তুমি নিশ্চয়ই ওদের মত নও, যে জানোয়ারগুলো আমাকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল? তাহলে বলব ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।'

গাড়ির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কম্বলটা বের করে মেয়েটার হাতে দিল রানা, দেখল খুশি হয়ে ওটা গায়ে জড়াল মেয়েটা। আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। এতই সূক্ষ্ম যে প্রথমে কুয়াশা বলে মনে হয়। হারিকেনের প্রথম আলামত। শীঘ্রি সাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে ভারী বর্ষণ শুরু হবে। আঙুল দিয়ে গাড়িটা দেখাল রানা। 'ভেতরে ঢোকো। চিন্তা কোরো না, আমি ধর্ষণ করি না। নাম কি তোমার?'

'কোরা।'

শরীর কম্বলে মুড়ে সামনের সীটে রানার পাশে বসল কোরা। কয়েক বারের চেষ্টায় এঞ্জিনটা স্টার্ট নিল, গিয়ার দিয়ে সামনে বাড়ল রানা। স্পষ্ট বুঝতে পারছে বেশ কয়েক জোড়া চোখ ঝোপের ভেতর থেকে অনুসরণ করছে ওকে। ভ্রূ কুঁচকে উঠল কোরার। হতাশ হয়েছে? হয়তো আশা করেছিল এখানেই গাড়িতে তুলে সুযোগ নিতে চেষ্টা করবে রানা।

ঝরঝরে গাড়িটা ওর কাভারের সঙ্গে ভাল মানিয়ে গেছে। মেয়েটা হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে নেবে আসলে সাধারণ এক ফকির টাইপের বীচ খেউমা ছাড়া আর কিছুই নয় ও। সেক্ষেত্রে বুঝবে ওদের এত কষ্টের পরিকল্পনা আর ফাঁদ পাতা বৃথা। রানাও সেটাই বোঝাবার চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

আধ মাইল পেরিয়ে গেল, কেউ ওরা কোনও কথা বলল না। অন্ধকারের বুক চিরে তিরিশ মাইল গতিতে কোঁকাতে কোঁকাতে ছুটছে গাড়ি। একমাত্র হেডলাইটটা ঢিলে হয়ে গেছে, দেখে মনে হচ্ছে বড়সড় একটা জ্বলন্ত চোখ। নির্জন দীর্ঘ রাস্তায় একটা গাড়িও নেই।

মেয়েটার চেহারাতেই স্পষ্ট যে প্রাণপণে মাথা খাটাচ্ছে, পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করছে। চুপ করে আছে রানা, চাইছে প্রথম চালটা মেয়েটাই দিক। মেয়েটা তার অভিনয় শুরু করার পরও বেশ খানিকক্ষণ বিপদের আশঙ্কা করছে না ও।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি, সেনোর?' পাশ ফিরে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

বীচ খেউমাদের মতই গা ছাড়া ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'জানি না আসলে। কেয়ারও করি না। ঘুরিফিরি এদিকেই। সব জায়গাই আমার জন্যে সমান। তুমি কোথায় যেতে চাও, সেনোরিটা?'

জবাবটা মনে মনে জানে রানা। মেয়েটাকে আদেশ করা হয়েছে ওর সঙ্গে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত থাকতে। মৃত্যুটা ওর মৃত্যু। অবশ্য যদি রানা ধরা খেয়ে যায় যে ও বীচ খেউমা নয়, তাহলেই। অস্ট্রেলিয়ান লোকটার ওপর শ্রদ্ধা জন্মাল রানার। ব্যাটা কাজে গাফিলতি করেনি। নিশ্চয়ই রিপোর্ট করেছে কর্তৃপক্ষের

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

কাছে। দুই আর দুইয়ে চার মেলাতে ভুল করেনি। অস্ট্রেলিয়ান না হলে আর কেউ ধরে নিয়েছে ওর সঙ্গে আজকে ঘটে যাওয়া ঘটনার যোগসাজস আছে। ছেঁড়া সূত্র বলতে রানাই কেবল বাকি। সেজন্যেই ওর পেছনে লোক লাগানো হয়েছে। প্রাকৃতিক পূলটার কথা মনে আসতে নিজের ওপর বিরক্ত বোধ করল রানা। গিয়ারগুলো ডোবার মধ্যে ফেলে আসা মোটেই ঠিক কাজ হয়নি। বীচ খেউমারা কখনও কিছু ফেলে যায় না। ওগুলো খুঁজে পাওয়ার অর্থ ওর কাভার ফুটো হয়ে যাওয়া।

মেয়েটা ঠিক করেছে কিভাবে খেলবে। সীটে ওর ধারে আরও ঘেঁষে এলো কোরা। গলার স্বর আগের চেয়ে কোমল, নিচু। 'আমি স্যান হুয়ানে যেতে চাই। ওখানে আমাকে পৌঁছে দেবে, প্লীজ? ওখানে আমার বন্ধু বান্ধব আছে, ওরা আমাকে টাকা-পয়সা আর পোশাক দিয়ে সাহায্য করবে। ওখান থেকে সহজেই নিউ ইয়র্কে ফিরতে পারব আমি।'

চওড়া হাসি হাসল রানা। ওর সেরা হাসিটাই উপহার দিল। সোহেলের মতে ওর এই হাসি দেখলে যেকোন মেয়ে গলে যাবে।

'শুনে ভাল লাগল যে স্যান হুয়ানে তোমার বন্ধু বান্ধব আছে, সেনোরিটা। বন্ধু থাকা সবসময় ভাল। স্যান হুয়ানে তোমাকে পৌঁছে দিতে পারলে আমি খুবই খুশি হতাম, কিন্তু একটা ব্যাপার তোমার নজর এড়িয়ে গেছে।'

আরও একটু কাছে সরে এলো মেয়েটা। মিষ্টি মাদকতাময় পারফিউমের গন্ধ পেল রানা। মনে মনে হাসল। ঠিকই ধরেছে ও, যৌন প্রলোভনের সেই পুরোনো ফাঁদ আসছে সামনে। ফাঁদটা পুরোনো হলেও ব্যর্থ হয় কমই। দুর্বল মুহূর্তে একটা ভুল, ব্যস, ওটাই হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

'বুঝতে পারলাম না। কি ব্যাপার আমার চোখ এড়িয়ে গেছে, সেনোর?'

পুরোনো এঞ্জিনের হুডটা দেখাল রানা। 'এটা। এটার কথা তুমি মাথায় রাখোনি। খেয়াল করে শোনো।' গতি একটু বাড়াল রানা। রড যেকোন সময় খুলে আসবে, আওয়াজ বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। মেয়েটা সম্ভবত গাড়ির ব্যাপারে কিছু জানে না, কিন্তু আওয়াজটাই বোঝার জন্যে যথেষ্ট। ট্যাপেটের আর্তনাদ কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। কর্কশ আওয়াজ ছাড়ছে ডিফারেনশিয়াল।

বিরক্তি আর উপলব্ধির ছাপ পড়ল মেয়েটার চেহারায়, মুখ কোঁচকাল। হতাশ বোধ করছে। ভাবছে আসলেই যদি রানা বীচ খেউমা হয় তাহলে তাকে নিয়ে কি করবে। শীঘ্রি হারিকেন আঘাত হানবে, তার মধ্যে একটা ভবঘুরের সঙ্গে ভাঙা গাড়িতে এই বিরান এলাকায় বেহুদা ফেঁসে যেতে হলে কারও ভাল লাগার কথা নয়।

সামান্য একটু উসকে দিতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। আস্তে ধীরে মেয়েটাকে আবার খেলতে বাধ্য করতে হবে।

হাসল রানা, ঝুঁকে মেয়েটার ঊরুতে হাত রেখে চাপ দিল একটু। 'চিন্তা কোরো না, হানি। আপাতত আমাদের কোনও বিপদ নেই, আসো না, একটু মজা করি দু'জনে মিলে? টাকা-পয়সা খুব একটা নেই আমার, কিন্তু সামান্য কিছু তো আছে। সাবধানে চালালে গাড়িটাও হয়তো পন্স পর্যন্ত নিয়ে যাবে আমাদের। তোমার যেমন বন্ধু আছে, তেমনি পন্সে আমারও বন্ধু আছে। ওদের কাছে ধার পেলে হয়তো তোমাকে আমি নিউ ইয়র্কের টিকেট করে দেব। কি পছন্দ হচ্ছে আমার কথা, শুগার?'

ঊরুতে হাত রাখায় সরেনি মেয়েটা, কিন্তু এবার ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'কেউ আমাকে হানি বা শুগার বলে ডাকুক তা আমি পছন্দ করি না, সেনোর! তার চেয়ে আমাকে কোরা বলে ডেকো, ওটাই আমার নাম। কোরা ল্যানযস। তোমার নাম কি, সেনোর?'

শ্রাগ করল রানা। মানুষ সমাজের যত নিচু স্তরেরই হোক না কেন তারও একটা আত্মমর্যাদা থাকে। সেটাই দেখিয়েছে কোরা।

'ঠিক আছে, কোরা, তুমি না চাইলে আদর করে ডাকব না। আমার নাম জিম। জিম হপকিন্স।' নকল পরিচয় পত্রে এই নামই লেখা আছে ওর। পেশাঃ ভবঘুরে।

শিউরে উঠল কোরা, রানার আরও কাছে ঘেঁষে এলো। 'আমি হয়তো তোমার সঙ্গে প্লেনে করে স্যান হুয়ানে যাব, জিম, অবশ্য তুমি যদি টাকা যোগাড় করতে পারো, তবেই। হয়তো যাবও না। আমি কিছু ঠিক করিনি এখনও।...শীত লাগছে আমার। মুয়ে ফ্রিয়ো! গাড়ি নামের এই আবর্জনায় ড্রিঙ্কট্রিঙ্ক কিছু রেখেছো তুমি?'

পূলে ফেলে আসা স্কচের বোতলের জন্যে মনটা হু-হু করে উঠল রানার। তবে ওসব না এনে ভাল হয়েছে। ছোটখাট এসব ভুলই এজেন্টদের ধরিয়ে দেয়। গরীব বীচ বামদের পক্ষে দামী স্কচ কেনা সম্ভব নয়।

'দুঃখিত,' বলল রানা, 'সঙ্গে কোনও ড্রিঙ্ক নেই। মায়াহুয়ারেজের আগে কোথাও পাওয়াও যাবে না। ওখানে থেমে নেব ওয়াইন। মনে হয় টাকা যা আছে তাতে কুলিয়ে যাবে।'

খুবই কাছে বসে আছে কোরা, আস্তে করে রানার বাহুতে হাত রাখল। 'তুমি খুবই গরীব, জিম?' গলা শুনে তাকে আন্তরিক বলেই মনে হয়।

হাতের ইশারায় গাড়ি আর জামাকাপড় দেখাল রানা। 'তোমার কি মনে হয়, কোরা? আমাকে দেখে কি রকফেলারদের ভাই-বেরাদার মনে হচ্ছে?'

হেসে উঠল কোরা, মিষ্টি জলতরঙ্গের মত আওয়াজে ভরে উঠল গাড়ির ভেতরটা। মনে মনে বিব্রত বোধ করল রানা। যে খেলা ও খেলছে সেটা খেলার রুচি হচ্ছে না, অথচ উপায় নেই। মেয়েটা সত্যি সুন্দরী। পরিস্থিতি অন্যরকম হলে হয়তো সময়টা রানা উপভোগই করত, কিন্তু এখন প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক থাকতে হচ্ছে। সুকৌশলে ওর সঙ্গে জুটিয়ে দেয়া হয়েছে মেয়েটাকে, ওর ওজন বোঝার জন্যে, দরকারে চিরব্যবস্থা করার জন্যে।

'আমি তোমাকে পছন্দ করে ফেলেছি, জিম,' বলল কোরা। 'সত্যি এত কম সময়ে কাউকে আমি পছন্দ করতে পারিনি আগে।'

'আমিও তোমাকে পছন্দ করে ফেলেছি, কোরা,' বলল রানা। 'আচরণে মনে হয়েছে তুমিও আমাকে পছন্দ করেছ, কিন্তু কিছু বলিনি। মায়াহুয়ারেজ পর্যন্ত

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

সময়টা ভালই কাটবে মনে হচ্ছে। তারপর একটু ঝামেলা হতে পারে। বোঝোই তো পুলিসকে সব রিপোর্ট করতে হবে। পুলিসের সব কাজই ঝামেলার ব্যাপার।'

হাসল কোরা, তারপর এমন একটা কথা বলল যে রানার মাথায় সতর্ক ঘন্টি বেজে উঠল। বেশি কথা বলে ফেলেছে ও। সম্ভবত মেয়েটার সন্দেহ জাগিয়ে দিয়েছে নিজেরই অজান্তে। 'মজার কথা বলো তুমি, জিম। কখনও মনে হয় তুমি শিক্ষিত, কখনও মনে হয় অশিক্ষিত। কোনটা ঠিক, জিম?'

সেরা চেষ্টাই করল রানা মেয়েটাকে বিশ্বাস করানোর। 'অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি কিছুদিন কলেজে পড়েছি। সে অনেক দিন আগের কথা। ভুলে যেতে চেষ্টা করেছি পরে, কিন্তু কখনও কখনও ভুলে যাই আমি কে, তখন মুখ দিয়ে ভদ্রলোকের ভাষা বের হয়। কেন? খুব অবাক লাগে?'

মেয়েটাকে শ্রাগ করতে দেখল রানা, বুঝতে পারছে মেয়েটাকে আবার দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে ও। কি বিশ্বাস করবে আর কি করবে না তা নিয়ে ভাবনায় পড়ে গিয়েছে কোরা। বোধহয় ভাবছে কিভাবে এগোবে এবার। রানার আন্দাজ সঠিক হলো, আরও কাছে সরে এলো কোরা। মেয়েটা কম খেলোয়াড় নয়, কাজের ক্ষতি না হলে ফাঁক তালে মজা লোটার অভ্যেসও আছে। কোরার পরবর্তী কথাগুলো ওর ধারণাকে আরও জোরাল করল। নতুন মিথ্যের জাল পাতছে কোরা। নতুন মিথ্যে দিয়ে পুরানোগুলোকে সত্যে পরিণত করছে।

'আমি তোমাকে বিরাট একটা মিথ্যে কথা বলেছি,' রানার হাঁটুতে হাত রাখল কোরা, আস্তে আস্তে উরু পর্যন্ত বোলাচ্ছে। 'ওই লোকগুলো আমাকে রেপ করার চেষ্টা করছিল না। ওরা আমাকে ঠকাতে চেয়েছিল। ওদের সঙ্গে *থাকা* শেষ হতে টাকা দিতে গড়িমসি করছিল। হারামজাদা সবকয়টা। ওরা টাকা না দেয়ায় ওদের সঙ্গে হাতাহাতি হয়, ওরা আমার জামাকাপড় সব ছিঁড়ে ফেলেছে। বুঝতে পারছ, জিম? আমি পিউটা। পতিতা। নিউ ইয়র্কে আমার অনেক খদ্দের, রোজগারও ভাল। কোনও কোনও রাতে পঞ্চাশ ডলার। কিন্তু এখানে...আমি মায়াহুয়ারেজে এসেছিলাম এক কাযিনের সঙ্গে দেখা করতে। কথা ছিল কাজ করব না, শুধু বিশ্রাম নেব কয়েকদিন, কিন্তু আমার কাযিন ওই লোকগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ওরা আমাকে মাছ ধরতে

যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল। মাছ ধরা আর...তুমি তো জানোই কি। আমি যেতে চাইনি, কিন্তু টাকা তো টাকাই, কি বলো? তারপর হারামজাদারা মজা লুটে টাকা দিতে অস্বীকার করল। আমি তোমাকে পছন্দ করি, জিম। মিথ্যে বলেছি বলে তুমি কি আমার ওপর খুব রাগ করেছ?' রানার কানে ঠোঁট ঘষল কোরা।

রানা বুঝতে পারছে, মেয়েটা স্ট্র্যাটেজি পাল্টে সরাসরি আক্রমণের পথ বেছে নিয়েছে। এখনও মেয়েটা মিথ্যে বলছে, অস্ট্রেলিয়ানটা বা যার জন্যেই কাজ করুক না সে, তবে রানা ধারণা করল এখনকার কথাগুলো আধা সত্যি ধরনের। মেয়েটার পেশা সম্বন্ধে ওর মনে কোনও দ্বিধা নেই, ঠিকই বলেছে কোরা। তবে স্বীকার করতেই হয় যে মেয়েটা পাকা অভিনেত্রী।

সহজেই মেয়েটার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে রানা। আধা সত্যি কথা বলে সম্পূর্ণ মিথ্যে গেলানোর চেষ্টা করছে কোরা ওকে। ওর বোঝা হয়ে গেছে যে মেয়েটা বীচ খেউমার কাভারটা মোটেই বিশ্বাস করেনি, যদিও বিশ্বাস করার ভান করছে, যৌন আকর্ষণ দিয়ে ওকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে পরে কি ঘটে দেখতে চাইছে।

মায়াহুয়ারেজের কাছে চলে এসেছে ওরা। রানা কিছু বলার আগেই সরে বসল কোরা। একটা ফিলিং স্টেশন আর জেনারেল স্টোরের আলো দেখা যাচ্ছে পথের ধারে। গাড়িটার তেল দরকার। স্টেশনের সামনে থামল রানা, ঠিক করে ফেলেছে কোরাকে স্থানীয় এজেন্টের হাতে তুলে দেবে ইন্টারোগেশনের জন্যে। পাকা মেয়ে। বুঝতে পারছে সহজ হবে না মেয়েটার মুখ খোলানো। তবে সময় পেলে কাজটা অসম্ভবও নয়।

স্যান হুয়ান এখনও অনেক দূরে। পন্সও কাছে নয়। পুরোটা পথ সতর্ক চোখ রাখতে হবে মেয়েটার ওপর। এর কাছ থেকে কবীর চৌধুরীর আস্তানা সম্বন্ধে তথ্য জানা গেলে ওর জন্যে ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে থাকা সহজ হবে। কবীর চৌধুরীর সঙ্গেই সোনার কাছে পৌঁছোতে হবে ওকে। এখন আর অন্য কোনও পথে সোনার কাছে যাওয়ার সময় নেই।

নাকে-মুখে ফুটকিওয়ালা একটা কিশোর স্টোরের সামনে মোটা এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল, ভাঙাচোরা গাড়িটা স্টেশনের সামনে থামতে দেখে এগিয়ে এলো, জানালার কাছে এসে সন্দেহের চোখে তাকাল রানার দিকে।

দশ ডলারের একটা নোট বের করল রানা পকেট থেকে।

'তেল লাগবে।'

'সি, সেনোর।'

কম্বল জড়িয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে কোরা। তার হাত ধরল রানা। ওর পরবর্তী কাজটা যতটা সম্ভব বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে।

গাড়ি থেকে বের হয়ে স্টোরের সামনে মোটা মহিলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। দুনিয়ার সব জেনারেল স্টোরে যে গন্ধ থাকে এ দোকানটা থেকেও সেই একই গন্ধ আসছে, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ট্রপিকাল মরিচের সুবাস। কোরার হাতে বিশ ডলারের একটা নোট দিল রানা। 'যা দরকার কিনে ফেলো, কোরা। বিশ ডলারের মধ্যে থাকবে। এর বেশি আমি দিতে পারব না।'

দোকানের ভেতর ঢুকে মোটা মহিলার সঙ্গে ড্রেস, স্যান্ডেল আর প্যান্টির দাম নিয়ে কথা বলতে শুরু করল কোরা। একটা সিগারেট ধরিয়ে দরজার কাছে বাইরে দাঁড়াল রানা। তাড়াহুড়ো করছে কোরা, ভাব দেখে মনে হচ্ছে দেরি হলে ট্রেন মিস হয়ে যাবে। কাপড়চোপড় কিনে পেছনের ঘরে চলে গেল পোশাক পরতে। রানা চলে এলো ফিলিং স্টেশনে, ফোন করল স্যান হুয়ানে, বিসিআই এজেন্টকে পেয়ে গেল প্রথম রিঙেই।

'হ্যালো?'

'আশফাক? রানা।'

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

'বলুন!'

'একটা মেয়ে জুটেছে সঙ্গে। পথে বিপদ হতে পারে। আমি সকালে যোগাযোগ না করলে হেড অফিস থেকে নির্দেশ চেয়ে সে অনুযায়ী কাজ করবে। আমরা এখন জানি যে গ্যালোস কেতে আস্তানা গেড়েছে কবীর চৌধুরী।'

'আর কিছু, মাসুদ ভাই?'

'না। রাখি।'

ফিলিং স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে নিভিয়ে দিল রানা, জানল না এই মাত্র কোরাও একটা ফোন করেছে জেনারেল স্টোর থেকে। অবশ্য জানলেও কি ঘটে তা দেখার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া ওর আর কিছু করার ছিল না।

গাড়ির কাছে যেতেই হাসিমুখে ওর দিকে তাকাল ছোকরা, ডান হাত বাড়িয়ে দিল। 'আরও দু'ডলার, সেনোর। টাঙ্কি একেবারে খালি ছিল, ভরে দিয়েছি।'

পাঁচ ডলারের একটা নোট দিল রানা ওকে। 'বাকিটা তোমার।'

দু'কানের কাছে গিয়ে ঠেকল ছোকরার হাসি, চলে গেল স্টোরের দিকে।

গোপন কম্পার্টমেন্ট খুলে ট্র্যান্সমিটারটা বের করল রানা, গুঁজে রাখল কোমরে। কম্পার্টমেন্ট বন্ধ করে পেছনের সীট ফেলে দিল আবার। ও সিধে হচ্ছে এমন সময়ে স্টোর থেকে বেরিয়ে এলো কোরা, পরনে লাল একটা সস্তা ড্রেস। তাতেও ভালই মানিয়েছে মেয়েটাকে। হতে পারে পতিতা, কিন্তু দেখতে সে যথেষ্ট সুন্দরী। চুল আঁচড়ে মাথায় একটা লাল রুমাল বেঁধেছে, কুমারী কিশোরীদের মত নিষ্পাপ লাগছে তাকে দেখতে। মোটা মহিলার কাছ থেকে ধার করে পাউডার আর লিপস্টিকও ব্যবহার করেছে।

গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে সামনে বাড়াল রানা, মনের ভেতরটা খচখচ করছে। মেয়েটাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি অবিশ্বাসী মনে হচ্ছে ওর। ফোন করেছে কাউকে? তাই হবে।

একটা লিকার স্টোরের সামনে আবার থামল রানা। দোকান মালিক হারিকেনের কবল থেকে দোকান বাঁচানোর জন্যে জানালাগুলোর বাইরে পেরেক ঠুকে বোর্ড আটকাচ্ছে। বৃষ্টির তোড় আগের চেয়ে বেড়ে গেছে অনেক। গাড়ির কাঁচ অস্পষ্ট হয়ে গেছে, ওয়াইপার পানি সরিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। থেকে থেকে দমকা বাতাসের ঝাপটা এসে লাগছে গাড়ির ফাঁকফোকর দিয়ে। হারিকেন এখনও অনেক দূরে, তবে আগমনী সংবাদ প্রেরণ করছে থেকে থেকে।

ক্যালিফোর্নিয়ার তৈরি কমদামী এক গ্যালন ওয়াইন কিনল রানা। ওকে বিদায় করেই ব্যস্ত হয়ে দোকান বন্ধ করে দিল মালিক, দোকানের পেছন দিকেই তার বাসা। ছেলেমেয়ে আর বউয়ের সাহায্য নিয়ে তাক থেকে বোতল নামিয়ে বেজমেন্টে নামিয়ে রাখছে।

গাড়িতে ফিরে ওয়াইনের জগের মুখ খুলে কোরার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। পাকা হাতে ভারী জগ মুখে তুলে দীর্ঘ চুমুক দিল কোরা। ড্যাশবোর্ড থেকে একটা রোড ম্যাপ নিয়ে সিলিং লাইটের স্বল্প আলোয় চোখ বুলাল রানা, টের পাচ্ছে ওর দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা, অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ওর, মনে হলো তীব্র ঘৃণা ঝরছে কোরার চোখ থেকে। এতই জোরাল অনুভূতি যে স্পষ্ট বুঝল রানা যে কারণেই হোক, ওকে ভয়ঙ্কর রকমের ঘৃণা করে মেয়েটা। সাধারণ কোনও ভাড়াটে পতিতা নয় সে এখন, আগের সেই নজরে রাখার ব্যাপারটা যেন বদলে গেছে, কোরা এখন শুধু নজর রাখার দায়িত্ব পালন করছে না, যেন ওর শেষ পরিণতি দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করছে।

ম্যাপ থেকে চোখ তুলল রানা, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি সরিয়ে নিল কোরা, সামনের দিকে চেয়ে আছে নিষ্পলক।

পরবর্তী শহর হারমিংগুয়েরস। ছোট শহর। সেখান থেকে একশো পঁচাত্তর মাইল দূরে পন্স। মাঝখানে লোকবসতি নেই বললেই চলে। দুয়েকটা ছোট বসতি যা আছে তার মাঝখানে অন্ধকার নির্জন পথ। ওখানে যেকোন বিপদ হতে পারে। বিরক্তির সঙ্গে স্কুবা ছোরাটার কথা ভাবল রানা। ওয়ালথার পি.পি.কেটার জন্যে আফসোস হচ্ছে। ওটা সঙ্গে থাকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করত।

ম্যাপটা ভাঁজ করে রেখে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল রানা। মায়াহুয়ারেজের আবছা আলো পেছনে পড়ে গেল। একচোখো দানবের চোখের মত জ্বলছে হেডলাইট, সে হলদে আলোয় সোনার টুকরো মনে হচ্ছে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। আগের চেয়ে আরও বেড়ে গেছে বৃষ্টির বেগ, এখন ঝরছে অঝোর ধারায়, উইন্ডশিল্ডে পড়ে পটর পটর আওয়াজ করছে। এখনও কাজ করছে ওয়াইপার, তবে সামনের দিকে দশ ফুটের পর আর দৃষ্টি চলে না। গাড়ির গতি বিশ মাইলের ওপরে ওঠাতে পারছে না রানা। সমুদ্রের তীর ধরে গেছে রাস্তা, মাঝে মাঝেই হামলা করছে দমকা বাতাস, থরথর করে কাঁপিয়ে ছাড়ছে প্রাগৈতিহাসিক গাড়িটাকে।

একটানা পথ চলছে ওরা, কোরা খুব একটা কথা বলছে না। মাঝে মাঝে ওয়াইনের জগ তুলে চুমুক দিচ্ছে, বাড়িয়ে দিচ্ছে রানার দিকে। বারবার এক পায়ের ওপর আরেক পা তুলে বসছে মেয়েটা, রানা চোখের কোণে দেখল সস্তা ড্রেসটা কোরার ঊরু ছেড়ে প্রায় কোমরের কাছে উঠে গেছে। পোশাকটা টেনে নামানোর কোনও চেষ্টা নেই কোরার। তার দরকারও নেই। পা-ই তার রোজগারের উৎস।

আরও কয়েক মাইল পেরিয়ে গাড়ি থামাল রানা, নিশ্চিন্ত হবার জন্যে এক টানে কোরাকে নিয়ে এলো গায়ের কাছে। প্রথমে বাধা দিতে চেষ্টা করল মেয়েটা, আড়ষ্ট হয়ে থাকল, তারপর দেহ শিথিল করে রানার গায়ে এলিয়ে পড়ল। হেসে উঠল কোরা। হাসিতে কোনও ক্ষোভ নেই।

'অদ্ভুত লোক তুমি, জিম,' বলল কোরা। 'পতিতাকে চুমু খেতে আপত্তি আছে তোমার? অনেকের আছে। তারা আর সবই করে, কিন্তু কখনও চুমু খায় না পতিতাদের।'

'আমার কোনও আপত্তি নেই।' কোরার সারা গায়ে হাত বোলাচ্ছে রানা। সাড়া দিতে শুরু করেছে কোরা, রানার কানে ঠোঁট ঘষল। পেশাদারী দক্ষতা দিয়ে রানাকে উত্তেজিত করে তুলতে চাইছে। একটু পর সন্তুষ্ট বোধ করল রানা,

www.MurchOna.com

মেয়েটার কাছে কোনও অস্ত্র নেই। স্টোরের মোটা মহিলা কোরাকে ছুরি বা পিস্তল সাপ্লাই দেয়নি।

সামান্য সময়ের জন্যে রানার কানের ওপর থেকে মুখ সরাল কোরা, এক নাগাড়ে কয়েকটা প্রশ্ন করল, 'ফিলিং স্টেশনে তুমি তোমার বন্ধুকে ফোন করেছ, জিম? কি বলল সে? টাকা দেবে? আমাকে স্যান হুয়ানের প্লেনে তুলে দেবে তুমি?'

'করেছি ফোন। ধার চাইতে গড়িমসি করছিল, কিন্তু অনুরোধ করতে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে। স্যান হুয়ানে যাচ্ছি আমরা, ওখানে চুটিয়ে ফুর্তি করব দু'জনে মিলে।' সহজেই মিথ্যে বলছে রানা, বাধছে না কোনও, ও ভাল করেই জানে পন্স পর্যন্ত যাওয়ার আগেই হামলা হবে, কাজেই ওর কথা সত্যি কি মিথ্যে সেটা জানার সুযোগ নেই কোরার।

অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল রানা। মেয়েটা ওর শরীরের যত্রতত্র হাতাতে শুরু করেছে। অভিজ্ঞতা সবসময়েই কাজে আসে। কোরার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। মেয়েটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতেও পারছে না রানা। ও যে রোল প্লে করছে তাতে সেটা মানায় না। তাছাড়া এখনও কিঞ্চিত সম্ভাবনা আছে যে ওর অনুমান কোরার ক্ষেত্রে ভুলও হতে পারে।

'ওসব পরে, লক্ষীসোনা। আগে একবার স্যান হুয়ানে পৌঁছে নিই, তারপর দেখবে কি হয়।'

কোরাকে জড়িয়ে ধরে কপালে একটা চুমু দিল রানা, আস্তে করে নেতিয়ে পড়া মেয়েটাকে সরিয়ে দিয়ে আবার হুইলের দিকে মনোযোগ দিল। পরবর্তী দু'মাইল ওয়াইনের নেশায় জড়ানো গলায় বলে গেল কোরা স্যান হুয়ানে রানাকে সে কিভাবে তৃপ্ত করবে। মাঝেসাঝে এখনও ওয়াইনের জগে চুমুক দিচ্ছে সে, তবে কতটা গিলছে সে-ব্যাপারে রানার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যতবার চুমুক দিয়েছে তাতে এক ঢোক করে খেলেও এখন তার অচেতন হয়ে পড়ার কথা।

বাতাসের গতি আরও বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে বৃষ্টির বেগ। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ভেজা শ্র্যাপনেলের মত আঘাত হানছে গাড়ির গায়ে।

হারমিংগুয়েরসের এক মাইল আগে হঠাৎ করে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে সাগরের দিক থেকে তীরের দিকে গেছে রাস্তাটা। মেরামতির কাজ চলছে, এক ধারে রোড কনস্ট্রাকশনের যন্ত্রপাতি দেখা গেল। ওগুলো পাশ কাটাল রানা, সামনে দেখা যাচ্ছে একটা লাল বাতি, ঝড়ো বাতাসে দুলছে ঘড়ির পেন্ডুলামের মত। ওটার আলোয় নিচের চকচকে সাইনবোর্ডটা পড়া যাচ্ছে: *বিপজ্জনক! সামনে রাস্তা মেরামত করা হচ্ছে।*

আসলেই রাস্তা মেরামতির কাজ চলছে। আসার পথেও দেখেছে রানা। বড় কোনও কাজ হচ্ছে তা নয়, সামান্য মেরামতি।

আপাত দৃষ্টিতে রানার মনে হলো কোনও কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে ওয়াইনের জগটা নামিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল কোরা। পরমুহূর্তে সতর্ক হয়ে উঠল ও। নরম গলায় ফিসফিস করছে কোরা, 'আমি এমন খেলা দেব যে সারাজীবনে আমাকে ভুলতে পারবে না, ডার্লিং। স্যান হুয়ানে গিয়ে কি পাবে তা আগেই একটু চেখে দেখো।' রানার গালে ভেজা ঠোঁট বুলাচ্ছে সে, কানের লতি জিভ দিয়ে চাটছে।

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল রানা, হুইল থেকে হাত উঠিয়ে মেয়েটাকে ঠেলে সরিয়ে দেবে কিনা ভাবল। চোখ সামনের দিকে। ভারী বৃষ্টির মধ্যে লাল বাতির নিচে এক পুলিস এসে দাঁড়িয়েছে। হাত নেড়ে থামতে ইশারা করছে। তার আরেক হাতে একটা বোর্ড, তাতে উজ্জ্বল কালিতে লেখা: *থামুন, ইন্সপেকশন করা হবে।*

এখানে এই নির্জন রাস্তায় এত রাতে পুলিশ ইন্সপেকশনের কোনও কারণ নেই। তাদের কোনও গাড়িও দেখা গেল না। রাস্তার ওপর কোমর সমান উচ্চতায় একটা বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে। বুঝতে রানার দেরি হলো না যে এটা মেয়েটার সেই ফাঁদ। গ্যাস পেডালে পা চেপে বসল ওর। যক্ষ্মা রোগীর মত মরণ কাশি কেশে উঠে গতি বাড়াল প্রাচীন এঞ্জিন। ঠেলে কোরাকে গায়ের ওপর থেকে সরিয়ে দিল রানা, গাড়িটা তীরের মত ছুটে যাচ্ছে নকল পুলিসের দিকে। মড়াৎ করে ভেঙে গেল বাঁশের বাধা। শেষ মুহূর্তে বিরাট এক লাফে গাড়ির গতিপথ থেকে ছিটকে সরে গেল নকল পুলিস। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা, ভারসাম্য ফিরে পেয়েই রিভলভার বের করেছে লোকটা। কানের পাশে একটা শিস শুনল। চুরচুর হয়ে ভেঙে গেল গাড়ির কাঁচ, পরমুহূর্তে অস্ত্রটার গর্জন শুনতে পেল।

বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে কোরা রানার ওপর, খামচি মারছে, তারই ফাঁকে চেষ্টা করছে হুইলের দখল নিতে, ইগনিশনের চাবির দিকে হাত বাড়াল। হাতের ঝাপটায় মেয়েটাকে সরিয়ে দিল রানা। ওর হাতে কামড় বসাল কোরা। প্রচণ্ড জোরে হাতের ধাক্কায় মেয়েটার মাথা সীটের সঙ্গে ঠুকে দিল রানা, ফুঁপিয়ে ওঠা শুনতে পেল। মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে অবশ হয়ে বসে থাকল কোরা, তারপর সমস্ত শরীর দিয়ে পড়ল রানার ওপর, চেষ্টা করছে চাবি ঘুরিয়ে গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করতে, গলা ছেড়ে বারবার একই কথা বলছে, 'বাস্টার্ডো! তুই আমার রেমনকে খুন করেছিস!'

মৃত স্কুবা ড্রাইভারের নাম বোধহয় রেমন ছিল। এতক্ষণে মেয়েটার রাগের কারণ বুঝতে পারছে রানা। গাড়ির ভেতর দিয়ে আরেকটা বুলেট বেরিয়ে গেল। অবশিষ্ট কাঁচগুলো ঝুরঝুর করে খসে পড়ল। বিস্ফারিত হলো রানার চোখ। দ্বিতীয় একটা ব্যারিয়ার দেখা যাচ্ছে সামনে। গায়ের জোরে ধাক্কা মেরে কোরাকে জানালার দিকে ঠেলে দিল রানা। ঠকাশ করে জানালায় বাড়ি খেল কোরার মাথা। জ্ঞান হারালো মেয়েটা।

গাড়িটা চল্লিশ মাইল বেগে ছুটছে, ধুঁকছে এঞ্জিন, যেকোন সময়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সামনের রাস্তায় চোখ রানার। রাস্তা জুড়ে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় গাড়ি, হুড তুলে কি যেন করার ভান করছে এক লোক। গাড়িটা

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

আসতে দেখে সরে দাঁড়াল, হাতে একটা টমিগান। ট্যাট-ট্যাট করে গর্জে উঠল অস্ত্রটা। গাড়ির একমাত্র হেডলাইটটা চুরমার হয়ে গেল।

এগোনোর পথ বন্ধ! রাস্তার দু'ধার খাড়াভাবে নেমে গেছে নিচে। কতটা নিচে তা দেখা যাচ্ছে না।

গাড়িটার পেছন দিক দিয়ে পার হলো রানা, রাস্তা ছেড়ে নেমে যেতে শুরু করল, কোথায় তা জানে না। এখন পর্যন্ত ওকে লক্ষ্য করে গুলি করেনি লোকগুলো। সম্ভবত মেয়েটার উপস্থিতিই তার কারণ। কোরা না থাকলে পরিস্থিতি হয়তো ভিন্নরকম হতো।

গাড়ির পেছনে এসে ঠকঠক করে বিঁধল এক ঝাঁক বুলেট। তীরের মত নেমে যাচ্ছে ওরা ঢাল বেয়ে। সামনে নিকষ কালো অন্ধকার। হুইলের সঙ্গে লড়ছে রানা, আশা করছে প্রাগৈতিহাসিক গাড়িটা উল্টে যাবে না। বুঝতে পারছে এখনও পালানোর সুযোগ আছে। অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া কঠিন হবে না। ওর মনে হলো অন্ধকারে রোলার কোস্টারে করে বিদ্যুৎ বেগে নিচের দিকে নামছে। গাড়ির গতি দ্রুত বেড়ে চলেছে। চাকাগুলো এখনও মাটিতে কামড় বসাতে পারছে। গ্যাস পেডালে পায়ের চাপ আরও বাড়াল রানা, পুরোনো এঞ্জিনের গর্জন শুনে বুঝতে পারল গতির সঙ্গে তাল মেলাতে চেষ্টা করছে ওটা।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়ে সমতল জমিতে নেমে এলো ওরা। রানার গায়ে এসে পড়ল প্রায় অচেতন কোরা। ঠেলে মেয়েটাকে সরিয়ে দিল রানা, সামনে কি আছে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। গাছ, টিলা, নাকি বেড়া?

সামনের চাকা দুটো হঠাৎ করেই মাটির ছোঁয়া হারাল। ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল গাড়ি, নাকটা কিসে যেন ধাক্কা খেল। রেডিয়েটরটা দুমড়ে মুচড়ে গেল। কেশে উঠে বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। দরজা খুলে বের হওয়ার চেষ্টা করল রানা, ভয় পাচ্ছে আগুন ধরে যাবে গাড়িতে। আটকে গেছে দরজাটা, খুলছে না। কোরাকে ঠেলে মেঝেতে ফেলল রানা, ওর দিকের দরজা খোলার চেষ্টা করল। দ্বিতীয় লাথিতে খুলল দোমড়ানো দরজা। পা বাড়িয়ে চমকে গেল রানা। শূন্যে ভাসছে ও, তারপর পতন শুরু হলো। দশফুট নিচে একটা কাদাময় খাদের ভেতর পড়ল ও। এক হাঁটু পানি থাকায় ব্যথা লাগল না।

কাদা খামচে খাদ থেকে উঠে গাড়ির সামনের দিকে চলে এলো ও। বাতাস আর বৃষ্টির তোড়ে পাঁচ ফুট দূরের কিছুও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। অনেক পেছনে আলোর আভা দেখে বুঝল আসছে লোকগুলো। এখনও অন্তত তিনশো গজ দূরে আছে। রেডিয়েটর খামচে ধরে বনেটের ওপর ওঠার চেষ্টা করল রানা, মেয়েটাকে হারাতে রাজি নয়। তাছাড়া জ্ঞান ফিরলে কোরা চিৎকার করে লোকগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সেটা হতে দেয়া যায় না।

গাড়ির ভেতরে পড়ে আছে কোরা, কোনও নড়াচড়া নেই। পেছনের সীট তুলে দ্রুত হাতে গোপন কম্পার্টমেন্ট খুলল রানা, ওয়াটারপ্রুফিঙে মোড়া নোটবই আর ফিল্ম কোমরে গুঁজে নিল। স্কুবা ছোরাটা স্পর্শ করে দেখল একবার। ওটা ব্যবহার করার কোনও ইচ্ছে নেই ওর, প্রতিপক্ষ সাবমেশিনগান সহ খুঁজছে ওকে।

সামনের সীটে পিছলে সরে এসে দেখল, কাছের বাতিটা এখন বড়জোর একশো গজ দূরে আছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না, ঝটপট সরে পড়া দরকার। লোকগুলো নিশ্চয়ই এলাকাটা চেনে, তাদের জানার কথা যে সামনে খাদ আছে, রানা ওটা পার হতে পারবে না।

মেয়েটাকে সঙ্গে নেবে স্থির করেছে রানা, যদিও ব্যাপারটা এখন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পাগলামি মনে হচ্ছে, তবে স্যান হুয়ানে কোনমতে পৌঁছোতে পারলে কোরার মুখ খোলানো খুব কঠিন হবে না। মেয়েটার পা ধরে টানল রানা, ওর হাতে খুলে এলো একটা সস্তা স্যান্ডেল। গাড়ি থেকে কোরাকে অর্ধেক বের করতেই ভণিতা ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা রানার ওপর, দু'হাতের বড় বড় নখ দিয়ে খামচি মারতে শুরু করল। ফায়ার সার্ভিসের সাইরেনের মত চিৎকার শুরু করেছে।

জোরে টান লাগাল রানা, পরমুহূর্তে পেটে জোরাল এক লাথি খেয়ে পিছলে চলে গেল বাইরে, আবার গিয়ে পড়ল কাদাময় খাদের ভেতর। একটানা চিৎকার করছে মেয়েলোকটা, কোনও শব্দ উচ্চারণ করছে না, রাগ জেদ আর ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে ফুটন্ত লাভার মত।

কোরাকে নেয়া যাবে না। লোকগুলো ওই চিৎকার শুনে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এসে হাজির হবে। দ্রুত চিন্তা করছে রানা। দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল ও, রাস্তা জুড়ে থাকা গাড়িটা বামদিক দিয়ে পাশ কাটিয়েছে, তারমানে এই খাদটা উত্তর-দক্ষিণে গেছে। ওকে যেতে হবে উত্তরে, মায়াহুয়ারেজের দিকে। দ্রুত পা চালাল রানা, সিদ্ধান্ত পালটে ফেলেছে ও, বিসিআই এজেন্টের সঙ্গে দেখা করে অস্ত্র নিতে গিয়ে দেরি করবে না, কবীর চৌধুরীর আস্তানায় হানা দেবে, প্রহরীর কাছ থেকে কেড়ে নেবে অস্ত্র। ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে, তবে এরা রিপোর্ট করার পর ভেতরে ঢোকা আরও বেশি কঠিন হবে। খুঁজতে থাকুক এরা ওকে এখানে, ওদের গাড়ি নিয়ে চম্পট দেবে ও।

লোকগুলো বেআক্কেল। গাড়ির কাছে কাউকে পাহারায় রাখার প্রয়োজন মনে করেনি, ভেবেছে লেজ গুটিয়ে পালাবে রানা ওদের ধাওয়া খেয়ে। মাঠে নেমে গেছে সবাই, চিৎকার করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখছে।

লোকগুলোকে আরও সামনে বাড়তে দিল রানা, তারপর খাদ থেকে উঠে এলো রাস্তায়। গাড়ির পাশে চলে এলো। চাবিটা নিয়ে গেছে ড্রাইভার। ইগনিশনের তার ছিঁড়ে জোড়া লাগাল ও। প্রথম চেষ্টাতেই স্টার্ট নিল ফাইন টিউন করা শক্তিশালী এঞ্জিন। গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল রানা, পেছনে হৈ-চৈ শুনতে পেয়ে হাসিটা আরেকটু চওড়া হলো। ক্রমেই বাড়ছে গাড়ির গতি।

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

চার

হুইস্কির নেশা জড়ানো ঘুমের ভেতর থেকে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল জোসেফ ক্যালডন, চুপ করে শুয়ে কিছুক্ষণ বাতাস আর বৃষ্টির বিরামহীন আওয়াজ শুনল। শেষ আবহাওয়া রিপোর্টে বলেছে হারিকেনটা ওদের ওপর সরাসরি আঘাত করবে না, উত্তর-পশ্চিমে সরতে সরতে পাশ থেকে সামান্য ঝাপটা দিয়ে যাবে। কি ঘটবে তাতে আপাতত ক্যালডনের কিছু যায় আসে না। তার মনে হচ্ছে দুনিয়াটা জাহান্নাম হয়ে গেলেও কিছু যাবে আসবে না। গুঙিয়ে উঠল ক্যালডন, দাঁত দিয়ে জিভ স্পর্শ করল, মনে হলো জিভটা জুতোর খসখসে সুখতলা হয়ে গেছে। ওই বীচ খেউমার হুইস্কির মত বাজে হুইস্কি গত কয়েক বছরে গেলেনি সে। মনে হচ্ছে রীতিমত বিষক্রিয়া হয়েছে।

মৃদু আলোর আভা ছড়ানো রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল সে। রাত একটার সামান্য বেশি। বীচ খেউমা এখন কোথায় সেটা ভাবল একবার। আরেকবার গুঙিয়ে উঠে কট থেকে পা নামাল সে, নাকের ভেতর আঙুল, অন্ধকারে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। হারামজাদা খেউমা কোনও আখ খেত বা খাদের মধ্যে মরে পড়ে থাকলে বাঁচা যায়। ওই শালার জন্যেই এখন বিপদে পড়তে যাচ্ছে সে।

প্যান্টের পায়ায় আঙুল মুছে ভারী জুতো জোড়া পরে নিল ক্যালডন। লুকিয়ে রাখা রামের মজুদে এবার হাত দিতেই হচ্ছে। বেশ কয়েক দিন হলো বোতল থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু এখন জাহান্নামে যাক সব।

শরীরটা খুব খারাপ লাগছে, গা গোলাচ্ছে। কোলম্যান লণ্ঠনটা না জ্বেলে বালির মেঝের ওপর দিয়ে একটা কমলালেবুর বাক্সের কাছে চলে এলো সে। ওটা ডেস্ক কেবিনেট আর ফুট লকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্ধের মত খুঁজল ভেতরে, পরিচিত আকৃতি হাতে ঠেকতে বের করে আনল অ্যাসপিরিনের একটা বোতল। ছয়টা ট্যাবলেট হাতের মুঠোয় নিয়ে ক্যান্টিনের গরম পানি দিয়ে গিলে ফেলল। পানির স্বাদে বিকৃত হয়ে গেল তার চেহারা।

একটু পরেই বেশ ভাল ঠেকল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল সে। রামের বোতলগুলো বেশি দূরে নেই, খানিক বাদে নেশায় সব ভুলে যাওয়া যাবে। রিভলভারের ওয়েব বেল্ট পরে নিয়ে জ্যাকেট গায়ে চড়াল। বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে উঠল, জ্যাকেটটা ভেজা আর ময়লা। হাফ প্যান্টটাও তাই। অথচ পরিষ্কার থাকতে ভালবাসে সে। নিজেকেই ঘৃণা করতে মন চাইছে এখন। পরিষ্কার থাকার অধিকার আছে সব মানুষের। খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখে হাত বোলাল। রাইফেলসে যখন ছিল তখন যুদ্ধের সময় ছাড়া পরিষ্কার থাকা যেত। ঠোঁট প্রসারিত হলো ক্যালডনের। আর্মিতে সময়টা চমৎকার কেটেছে। কিন্তু সেসব এখন অতীত। বর্তমানে মস্ত সমস্যায় জড়িয়ে গেছে সে।

আর্মিতে কবীর চৌধুরীর চাকরির মত বেতন এত পাওয়া যেত না। না, বলতেই হয়, মিস্টার চৌধুরীর হাত দরাজ। মানুষটা ভদ্রলোক। আর ভদ্রলোকদের দু'চোখে দেখতে পারে না ক্যালডন। বেতন দেবেন ঠিকই, যতক্ষণ না কাজ ভণ্ডুল করে কেউ। কোনও দয়া নেই লোকটার। কাজে ভুল হলে লাথি মেরে খেদিয়ে দেবেন দুনিয়ার বাইরে, পরমুহূর্তে ভুলে যাবেন লোকটার কথা। ক্যালডন নিজেই কবীর চৌধুরীর ঠাণ্ডা মাথার খুনের সাক্ষী। শুধু এইড্‌স্ নিরাময়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়েই অন্তত পঞ্চাশজন লোক খুন করেছেন বস্। তাঁর হয়ে বেশ কিছু কাজ সে নিজেও করেছে।

তাঁবুর খুঁটিতে গাঁথা একটা পেরেক থেকে বুশ হ্যাটটা খুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। কাঁদছে প্রকৃতি অঝোর ধারায়। হু-হু করে বাতাস বইছে বৃষ্টি বুকে নিয়ে। ঘুমিয়ে পড়ে কাজে ফাঁকি না দিলে সামনে কোথাও একজন গার্ড থাকার কথা। হারামজাদা থাকুক আর না থাকুক আপাতত কিছু বলবে না সে। হুইস্কির প্রভাব দ্রুত কেটে যাচ্ছে। শীঘ্রি রামের বোতলগুলো খুঁজে বের করতে না পারলে নেশা একেবারেই টুটে যাবে। আর তার মানেই দুশ্চিন্তার পালা। একবার পেটে মদ পড়লে ভাল করে ভেবে দেখতে পারবে সে পরিস্থিতিটা, বুঝতে পারবে ঠিক কতটা বিপদে আছে সে। হয়তো আসলে কোনও বিপদ হবেই না, ভাগ্যের সহায়তায় বেঁচে যাবে সে।

বাতাসের ঝাপটায় জোরেশোরে এসে তার মুখে আছড়ে পড়ছে বৃষ্টি। একটা সিগারেট ধরানোর জন্যে আবার কিছুক্ষণের জন্যে তাঁবুর ভেতর ঢুকল সে, ভাবছে বেশিদিন তার ভাগ্য আর সহায়তা নাও করতে পারে। কবীর চৌধুরীর সামনে এমনিতেই অনেকবার সে মিথ্যে বলে ক্ষমা পেয়েছে। এবার হয়তো...

সিগারেটে গোটা তিনেক টান দেবার পর আবার বাইরে বের হলো সে, হাতের মুঠোয় সিগারেট লুকিয়ে রেখেছে যাতে নিভে না যায়। এক মিনিট পুরো হবার আগেই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল ক্যালডন। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো গরম, দমকা বাতাসে ছিটকে আসছে নানা দিক থেকে। ভালই লাগল তার। অনেক দিন পর গোসলটা হয়ে যাচ্ছে।

কেউ চ্যালেঞ্জ করল না। কোথাও প্রহরীর দেখা নেই। ব্যাটা বোধহয় সুন্দরী পতিতাটার সঙ্গে মজা লুটছে, ভাবল সে। কোরা ল্যানযস। মেয়েটা প্রায় হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছিল বীচ খেউমাকে। হারামজাদা পালিয়েছে সেটা কোরার দোষ নয়।

অন্ধকারে বৃষ্টিবাদলার মধ্যে সামনের কিছু দেখতে পাচ্ছে না ক্যালডন, তবে পতিতার তাঁবু কোথায় সেটা মনের চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কাছাকাছি মোট ছয়টা তাঁবু আছে। একটু দূরেই বাঁকা চাঁদের মত সৈকত। ঢেউ আছড়ে পড়ার আওয়াজ আসছে ওদিক থেকে। বামদিকে রেডিও টেন্ট, অপারেটর স্পার্ক বোধহয় ঘুমাচ্ছে। ডানদিকে বাকি চারটে তাঁবু। শেষ তাঁবুটা খালি করে

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

মেয়েলোকটাকে থাকতে দিয়েছে সে।

সৈকতে চলে এলো ক্যালডন। একটা স্টীলের পিয়ার সাগরের একশো ফুট গভীর পর্যন্ত চলে গেছে। এমনিতে মিস্টার চৌধুরীর ক্রিস-ক্র্যাফট এখানেই থাকে, কিন্তু এখন আছে গ্যালোস কে'র নিরাপদ বন্দরে। এখানে থাকলে বোটটা ভেঙে চুরমার হয়ে যেত, ভাবল ক্যালডন। পায়ারের ওপর সগর্জনে আছড়ে পড়ছে সাগরের উন্মত্ত ঢেউ। সাদা ফেনায় মাঝে মাঝেই ঢেকে যাচ্ছে স্টীলের কাঠামোটা। অন্ধকারেও সাদা ফেনা পরিষ্কার দেখা যায়। ফসফোরেসেন্স।

ক্রিস-ক্র্যাফট না থাকার অর্থ চৌধুরীর বর্বর হিংস্র ক্রুদের সঙ্গে সৈকতে আটকা পড়ে গেছে সে। কবীর চৌধুরী আছেন তাঁর বিলাসবহুল ভিলায়। দুনিয়ার সেরা খাবার সার্ভ করা হচ্ছে তাঁকে, সেরা মদটা মুখের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। আর এদিকে ক্যালডনকে সহ্য করতে হচ্ছে প্রকৃতির অত্যাচার। বরাবরের মতই পিয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে এক মাইল দূরের গ্যালোস কে'র আবছা আলোর দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যালডন, নিজের জন্যে করুণা হচ্ছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, সৈকতে আছে সেটাই হয়তো ভাল হয়েছে। যেভাবে কাজে ব্যর্থ হয়েছে সে, তাতে এখানে থাকাই নিরাপদ। তাছাড়া মদ খেয়েছে সে। চৌধুরীর আশেপাশে থাকলে চৌধুরী নির্ঘাত টের পেয়ে যেতেন, এক মিনিটে পেট থেকে টেনে বের করে ফেলতেন এদিকে কি ঘটেছে। লোকটার চোখ সব দেখতে পায়। মিথ্যে বলা তাঁর কাছে অর্থহীন।

প্রহরীর এখনও দেখা নেই। আন্দাজে মদের মজুদ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল ক্যালডন, উঁচু একটা বালির ঢিবির কাছে এসে উঠতে শুরু করল বালি বেয়ে। পায়ের তলায় বসে যাচ্ছে ভেজা বালি, এগোনো কঠিন। ওপরে উঠে একটু থামল দম নিতে। এখান থেকে গ্যালোস কে'র আলো আরও স্পষ্ট দেখা যায়। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মিস্টার চৌধুরীকে অভিশাপ দিল সে। কুকুরের মত পরিশ্রম করছে সে, আর চৌধুরী এখন মহা আরামে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন।

ঢিবি বেয়ে নামতে শুরু করল ক্যালডন। বীচ খেউমার কথা মনে পড়তেই নিজেকে গালি দিল। লোকটাকে খুন করে ফেলা উচিত ছিল। নির্দেশ যখন সে মানেইনি, তো ঝুঁকি নিয়ে লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার ছিল না। খুন করে পরে মিস্টার চৌধুরীর প্রশ্নের জবাব দেয়াও বোধহয় ভাল ছিল।

বুনো কলা আর পামগাছের মাঝখানে জন্মানো কয়েকটা প্যালমেটোর সামনে থামল সে। স্মৃতির সাহায্য নিয়ে বামদিকের পাম গাছের কাছ থেকে চার কদম বামে সরে এসে বালি খুঁড়তে শুরু করল। বুকের ভেতরটা নড়ে উঠল হাতে বালি ছাড়া আর কিছু না ঠেকায়। তারপর একটা বোতলের মসৃণ গোল মাথায় হাতের ছোঁয়া লাগল। ফোঁস করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল ক্যালডন। আছে! বোতলটা তুলে এনে মুখ খুলে ঠোঁটে লাগিয়ে দীর্ঘ চুমুক দিল। গলা বেয়ে নামতে শুরু করল গরম তরল।

চারটে বোতল নিয়ে তাঁবুতে ফিরল সে। ফেরার পথেও প্রহরীকে দেখেনি। রাগ হয়নি সেজন্যে। বোতল পাওয়া গেছে এটা একটা বিরাট স্বস্তির ব্যাপার। প্রহরী বোধহয় পাহারা ছেড়ে পতিতাটার সঙ্গে গিয়ে শুয়েছে। তা শুক। কিছু যায় আসে না। এই দুর্যোগের রাতে এখানে কেউ আসবে না মরতে।

কটে বসে রাম গিলতে গিলতে ঝড়ো বাতাসের আওয়াজ আর বৃষ্টির একটানা তান শুনল সে। সর্বক্ষণ আফসোস করছে। মিস্টার চৌধুরীকে বীচ খেউমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাটা জানানো দরকার ছিল। তাহলে আজকে এই ভয়ের মধ্যে থাকতে হতো না।

পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন কবীর চৌধুরী। কাউকে আমার এলাকায় ঢুকতে দেবে না। কাউকে না। আমার নির্দেশ ছাড়া তোমরা কেউ পাহারা বাদ দিয়ে বেড়ার বাইরে যাবে না। এই নির্দেশটাও সে অমান্য করেছে। ঢকঢক করে রাম গিলল ক্যালডন, আস্তে করে মাথা নাড়ল।

শালার টোকাই। না, দোষ পুরোপুরি টোকাইয়ের না। লোকটার হুইস্কি খেয়ে নিজেকে বিরাট একটা কিছু মনে হচ্ছিল, তখনই সে মজা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ভবঘুরেটার ভেতরে ঢোকার প্রচেষ্টা রিপোর্ট করেনি সে। ড্রাইভার হারলেমকে বলেছিল কাউকে কিছু না জানাতে। সে হেসে বলেছে কেউ জানবে না। জানানোর দায়িত্ব তার নয়, কাজেই লোকটা নিরাপদ। তার ড্রিঙ্কিঙের ব্যাপারেও কাউকে কখনও কিছু বলেনি হারলেম, সহজ পথে টাকা কামানোর উপায় না দেখলে গা নড়ায় না সে। না, হারলেম তাকে বিপদে ফেলবে না।

রামে দীর্ঘ একটা চুমুক দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল ক্যালডন। কোরার কথা ভাবল খানিক। পেটের কাছটা শিরশির করে উঠল। কিন্তু রামে চুমুক দিয়ে মেয়েটার কথা ভুলে গেল আবার। যদি ইচ্ছে হয় তো ওর কাছে যাওয়া যাবে, মেয়েটা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

সমস্যা হচ্ছে, আপনমনে ভাবল ক্যালডন, নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করেছে সে, তারপর প্যাঁচ লেগে গেছে সবকিছুতে। সাগরে আজকে কি ঘটেছে সেটা তার পরিষ্কার জানা নেই। শুধু শুনেছে রেমন খুন হয়েছে। বীচ খেউমার কথাটা রিপোর্ট করলে তার আর কোনও দায়দায়িত্ব থাকত না, কিন্তু...

বিশেষ করে বিচ খেউমার জন্যে নিজে থেকে ফাঁদটা পাতা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। গুঙিয়ে উঠল ক্যালডন, বালুর মাছি যেখানে যেখানে কামড়েছে সেসব জায়গা খসখস করে চুলকাতে শুরু করল। মদ সবসময়েই তাকে বোকা বানিয়ে দেয়, অথচ মদ ছাড়ার কথা সে ভাবতেও পারে না। এত বছর মদ গেলার পর এখন আর ছাড়া সম্ভবও নয়।

বিকেলে যখন মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলল তখন বীচ খেউমার কথা রিপোর্ট করেনি সে। আসলে তখন খেউমার দেয়া হুইস্কির নেশা পুরোপুরি কাটেনি। সে চেয়েছিল যত দ্রুত সম্ভব ফোন রেখে দিতে। বেশি খেলে গলা শুনেই মিস্টার চৌধুরী বুঝে যান কখন সে ড্রিঙ্ক করছে। আজকে অবশ্য টের পাননি। সেকারণে তাকে গ্যালোস কে'তে কৈফিয়ত দিতে যেতে হয়নি। রামের প্রভাবে ভয় কমে আসছে এখন। বিশ মিনিট পর ক্যালডনের মনে হলো সে আসলে কবীর চৌধুরীকেও ভয় পায় না।

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

বোতলে চুমুক দিতে দিতে গতকালের কথা ভাবল সে। রেমন রেমিরেজ গত রাতে পতিতাটার কাছে থেকেছিল। কোরা ল্যানযস পাগলের মত ভালবাসে রেমনকে। রেমনের দিক থেকে ব্যাপারটা ভিন্ন ছিল। ঠেকার কাজ চালিয়ে নিচ্ছিল সে। ভীষণ নারী লোলুপ ছিল রেমন। আর দ্বীপে মেয়েদের আগমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে মিস্টার চৌধুরীর।

রেমনের অভিসারের খবর মিস্টার চৌধুরীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিল সে। ওই পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল।

আরেক চুমুক রাম খেল ক্যালডন, তিক্ত হাসল। রেমন রেমিরেজকে সে পছন্দ করত না। এক খুনী কখনোই আরেক খুনীকে পছন্দ করে না। লোকটা সে যত কর্কশ হোক, বলতেই হয় পতিতাটার সঙ্গে নরম আচরণ করত রেমন। লোকটার বড় বড় দাঁত বের করা হাসি মনের চোখে দেখতে পেল ক্যালডন। ক্রিস-ক্র্যাফট থেকে নেমে তাকে রেমন হাসতে হাসতে বলেছিল, 'চাইলে তোমরা সবাই কোরার কাছে যেতে পারো। বাজি ধরতে পারি তোমাদের একাকিত্ব ভুলিয়ে দেবে কোরা। ঝড়ের পুরোটা সময় দারুণ কাটবে তোমাদের।'

রেমন যতই হাসুক, অন্যরা হাসতে পারেনি। পতিতা হোক আর যাই হোক সে রেমনকে ভালবাসে, অন্য কাউকে নেবে না। শ্রাগ করল ক্যালডন, মেয়েলোক; পতিতা হলেও বড় আজব সৃষ্টি।

তখনও কোনও গণ্ডগোল হয়নি। তারপর কে'তে তৎপরতা শুরু হলো। সেসময় সে স্পার্কের সঙ্গে রেডিও টেন্টে ছিল। এক স্কুবা ডাইভারের কথা উত্তেজিত স্বরে বলাবলি করা হচ্ছিল। পাইলট সাগরে রক্ত দেখেছে রিপোর্ট করতেই ব্যস্ততা আরও বেড়ে যায়। লোকটার ওসময়ে ওখানে থাকার কথা নয়। বীচ খেউমা ছাড়া আর কোনও লোকও এদিকে দেখা যায়নি গত কয়েকদিনে। খবরটা শুনেই পেটের কাছে দলা পাকিয়ে গিয়েছিল তার, মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিল রেমনকে খুন করা লোকটা সেই বীচ খেউমা না হয়ে যায় না। এটাকে অনুভূতি বলা হোক বা ইনটুইশন, তার ধারণা স্থির হয়ে গিয়েছিল। যে লোকটাকে নিয়ে সে আগের দিন মজা করেছে সে-ই এই ডাইভার। অথচ রিপোর্ট করেনি সে। রিপোর্ট করেনি কারণ সে মাতাল ছিল। এধরনের ভুল মিস্টার চৌধুরী কখনোই ক্ষমা করবেন না।

রেডিও টেন্ট থেকে বেরিয়ে গ্যালোস কে'র ব্যস্ততা দেখেছে সে। কপ্টার উড়ছিল আকাশে। সেসনা বিমানটা চক্কর কাটছিল। ক্রিস-ক্র্যাফট আর অন্য বোটগুলো টহল দিতে বেরিয়ে এসেছিল নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে খোলা সাগরে।

রেডিও টেন্ট থেকে মিস্টার চৌধুরীর গলা শুনতে পাচ্ছিল সে। নিজের হাতে কর্তৃত্ব তুলে নিয়েছিলেন চৌধুরী। বীচ খেউমা যেই হোক না কেন তাকে মিস্টার চৌধুরী অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলেন। সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন লোকটাকে ধরতে।

মদে চুমুক দিয়ে সিগারেটের জ্বলজ্বলে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যালডন। আবহাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী সত্যি যদি হারিকেন সরাসরি আঘাত নাও হানে, তবুও ঝড়-বৃষ্টির জন্যে আজকে ভোরের আলো ফুটতে অনেক দেরি হবে। হোক দেরি। কিছুই ভাল লাগছে না ক্যালডনের। সে এখন ড্রিঙ্ক করবে, ভুলে যাবে সমস্ত আসন্ন সমস্যার কথা।

প্রথম বোতলটা দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাওয়ায় অবাক হলো ক্যালডন। যতটা লাগছে তার চেয়ে অনেক ভাল লাগার কথা, অথচ লাগছে না। চিন্তাও দূর হচ্ছে না। বারবার মিস্টার চৌধুরীর গলা শুনতে পাচ্ছে সে কানের কাছে।

আরেকটা রামের বোতল খুলে তাঁবুর বাইরে হুঙ্কার ছাড়া বাতাসের আওয়াজ শুনল ক্যালডন, হোলস্টার থেকে তেল মাখানো রিভলভারটা বের করে আদরের সঙ্গে হাত বুলাতে শুরু করল। রিভলভার তার কাছে সবসময়েই পিস্তলের চেয়ে ভাল বলে মনে হয়। অটোমেটিক জ্যাম হয়ে যায়। ক্লিপ স্প্রিং ঢিলে হয়ে যায়। রিভলভারে সে সমস্যা নেই। এই রিভলভারটা প্রায় নতুন। তার সবচেয়ে পছন্দের ওয়েবলি অবশ্য নয়, তবে চমৎকার জিনিস। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন ·৪১ ম্যাগনাম। নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি পাঠাতে এর জুড়ি নেই। প্রচুর ব্যবহারে রিভলভারটার জায়গায় জায়গায় রং উঠে গেছে ইতিমধ্যেই।

সামান্য সময়ের জন্যে কানের কাছে একটা গলা শুনতে পেল ক্যালডন। *দেরি কিসের, মুখের ভেতর নলটা পুরে দিয়ে ট্রিগারটা টেনে দাও। মাথাটা খেলাও, একটু সাহস করো। কবীর চৌধুরীর উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে হলে এটুকু তোমার করতেই হবে। টানো ট্রিগার, বোকা কোথাকার। দেরি কোরো না। বয়স কত হলো সে খেয়াল আছে? ছাপ্পান্ন। কত মানুষ অনেক আগেই মারা যায়! অনেক মানুষ মেরেছ তুমি। খুন করে পার পেয়ে গেছ বারবার। অনেক তো হলো, এবার ট্রিগারটা টেনে খেলা শেষ করে দাও। ফাঁকি দিয়ে চলে যাও পৃথিবী ছেড়ে। এটাই সহজ পথ। ট্রিগারটা টিপে দাও, ক্যালডন।*

রিভলভারটা হোলস্টারে রেখে দিল ক্যালডন। রামের কারণে আত্মহননের চিন্তা মাথায় আসছে। এখনও আশা শেষ হয়ে যায়নি। শেষ পর্যন্ত হয়তো কিছুই ঘটবে না। মিস্টার চৌধুরী হয়তো টেরই পাবেন না সৈকত ছেড়ে সে বাইরে গিয়েছিল, বীচ খেউমার গাড়িটা জঙ্গলের ভেতর খুঁজে পেয়েছে, সেই সঙ্গে হেলাফেলায় ফেলে যাওয়া বীচ খেউমার পোশাক আর খালি একটা স্কচের বোতল।

ফোঁশ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যালডন। অনেক দূরে রেঞ্জের বাইরে থেকে শক্তিশালী বিনকিউলার দিয়ে বীচ খেউমাকে আসতে দেখেছে তারা। তখন তাকে দেখে বীচ খেউমা মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল ক্ষিপ্র একটা বাঘ। প্রতিদ্বন্দ্বী শক্ত হলে চিনতে ভুল হয় না ক্যালডনের। ওই লোক মিস্টার চৌধুরী যাকে হন্যে হয়ে খুঁজেছে সেই লোক না হয়ে যায় না।

সাইটে লোকটাকে পেয়েছিল সে। ওই রেঞ্জ থেকেও স্টেনগানের এক পশলা গুলিতে ঝামেলা মিটিয়ে দেয়া যেত। তার বদলে মেয়েলোকটাকে কাজে লাগিয়ে কৌশল করতে গেছে সে, শর্টকাট পথে লোকদের নিয়ে মায়াহুয়েজে হাজির

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

হয়েছে। ওখানে কোরা ফোন করতে ফাঁদ পেতেছে আরও সামনে।

আগের চেয়ে আস্তে আস্তে রামের বোতলে চুমুক দিচ্ছে এখন ক্যালডন, মনের মাঝে ব্যর্থতার একটা উপযুক্ত অজুহাত খুঁজছে। ওখানে মিস্টার চৌধুরীর এলাকায় লোকটাকে খুন করা বিপজ্জনক ছিল। কে বলতে পারে কেউ দেখছিল কিনা। তাছাড়া অধীনস্থ লোকগুলোকে একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সে বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু মেয়েমানুষের মুখ বন্ধ থাকবে কিনা তা কে জানে। কোরাও তখন সঙ্গে ছিল।

আস্তে করে মাথা নাড়ল ক্যালডন, একটা যুক্তিও ধোপে টিকবে না। আসলে নিজের কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, তখন তখনই লোকটাকে খুন করতে চায়নি সে। জানতে চেয়েছিল কার জন্যে লোকটা কাজ করছে, সেলোক কেন মিস্টার চৌধুরীর ব্যাপারে এত উৎসাহ দেখাচ্ছে। তথ্যগুলো জানতে পারলে মিস্টার চৌধুরীর সামনে দাঁড়ানো যেত। বীচ খেউমার কথাটা রিপোর্ট না করার অপরাধও তাতে ঢাকা পড়ে যেত।

বোতলের মুখটা পেঁচিয়ে লাগাল ক্যালডন, আপাতত যথেষ্ট হয়েছে। প্রহরীর কি হলো সেটা জানা দরকার। তাছাড়া সেই মেয়েলোকটারও খোঁজ নেয়া দরকার। হঠাৎ করেই কামনা জেগে উঠল কোরার কথা ভাবতে গিয়ে। রামটা এতক্ষণে সত্যিই কাজ করতে শুরু করেছে। বেশ ভাল লাগছে এখন। হ্যাঁ, মেয়েলোকটার কাছে যাবে সে। যাওয়া দরকার। তাকে সাবধান করে দিতে হবে, যাতে মুখ না খোলে। সে এমন একটা ভাব করবে যে ব্যাপারটা তেমন একটা গুরুতর নয়, সে শুধু চাইছে না লোকে জানুক কিরকম বোকা বনেছে তারা সবাই ওই লোকটার কাছে।

তাঁবু ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সে, লক্ষ করল বাতাস আর বৃষ্টির বেগ আগের চেয়ে বাড়েনি। আসলেই হয়তো হারিকেনের আসল ঝাপটা এদিকে লাগবে না।

মেয়েটার তাঁবুর দিকে পা বাড়িয়ে নিজের আরেকটা ভুল স্বীকার করল ক্যালডন। রেমন মারা গেছে খবরটা কোরাকে দেয়া ঠিক হয়নি। মেয়েটা প্রথমে পাগলের মত আচরণ করছিল, তারপর একটু শান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ল। খানিক পর বলতে শুরু করল সে আগে প্রতিশোধ নেবে, তারপর আত্মহত্যা করবে। রেমনকে ছাড়া তার বেঁচে থাকার কোনও ইচ্ছে নেই।

বালি আর বৃষ্টির ঝাপটা থেকে বাঁচানোর জন্যে জীপ গাড়ি তারপুলিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, ওটা পাশ কাটাল ক্যালডন, পৌঁছে গেল কোরার তাঁবুর সামনে। ঠোঁট বাঁকা করে হাসল। মেয়েমানুষ! বিশেষ করে প্রেমে পড়া মেয়েমানুষ বড় আজব চিড়িয়া। তারওপর যদি হয় প্রেমে পাগল স্প্যানিশ পতিতা তাহলে আর কোনও কথা নেই। কোরাকে নজরে রাখতে হবে। কোনও ভাবে বিপদ কাটাতে পারলে কিছুতেই কোরাকে মুখ খোলার সুযোগ দেয়া যাবে না। একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়তো যথেষ্ট হবে। তাঁবুর ভেতরে ঢুকল ক্যালডন।

কটের ওপর নড়েচড়ে শুলো কোরা। 'কে?'

'আমি জোসেফ।' অন্ধকারে হাতড়ে কটের কাছে চলে এলো ক্যালডন। মেয়েলোকটার গন্ধ এসে লাগল নাকে। সস্তা পারফিউম আর পতিতার ঘামের মিশ্র গন্ধ। পেটের ভেতরটা কেমন গুলিয়ে উঠল ক্যালডনের। তাতে কি? প্রচুর রাম গিলেছে সে, ভাল লাগছে এখন। এখন এসব খেয়াল করার সময় নয়। জাহান্নামে যাক দুনিয়া। যতক্ষণ পারছে জীবনটা সে উপভোগ করবে না কেন? মিস্টার চৌধুরীর ভয়ে আগেই মরে যাবার কোনও অর্থ হয় না। সান্ত্বনা পেল মনে, শেষ পর্যন্ত কিচ্ছু হবে না ওর। খামোকা ভেবে ভেবে মনের মাঝে ভয় পাকিয়ে তুলছে সে।

'কি চাও, জোসেফ? আমি ক্লান্ত। ঘুমাব এখন।'

কটের ওপর বসল ক্যালডন, হাত বাড়িয়ে কোরার ঊরু পেয়ে হাত বুলাল। সস্তা লাল কাপড়টা কোমরে উঠে আছে। ভাল।

পা সরিয়ে নিল কোরা, চাপা স্বরে বলল, 'জ্বালাতন কোরো না, জোসেফ, আমার কাছে কিন্তু একটা ব্লেড আছে।'

হাসল ক্যালডন। মেয়েটা সম্ভবত সত্যি কথাই বলছে। দুনিয়ার নানা প্রান্তে আগেও দেখেছে সে, পতিতারা ছোট একটা ব্লেড জিভের সমান্তরালে মুখের ভেতর রাখে। কেউ যদি তাদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে বা ঠকাতে চায় তাহলে এক পোঁচে চামড়া-মাংস চিরে দেয়। কয়েক পোঁচে যেকোন লোকের বারোটা বেজে যেতে বাধ্য।

আবার কোরার উরুতে হাত রাখল ক্যালডন। 'কোরা, কোরা, অমন করো কেন? অত রাগ কি ভাল? আমি জোসেফ। টাকা আছে আমার কাছে। চট করে বিশ ডলার পেতে চাইলে রাজি হয়ে যাও।'

'না, চাই না টাকা। আমি এখন কাউকে আনন্দ দেব না। আমি শোক পালন করছি রেমনের জন্যে। চলে যাও।'

হাসতে গিয়েও সামলে নিল ক্যালডন। 'বেশ কোরা, তুমি যদি শোক পালন করো তাহলে...ঠিক আছে, আমি দুঃখিত, চলে যাচ্ছি।'

চরম আনন্দ পেতে বড় ইচ্ছে করছে। কোরার নধর শরীরটা নিয়ে খেলতে না পারলে জীবনটা এখন ব্যর্থ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে, কিন্তু উঠে দাঁড়াল ক্যালডন, ব্লেডের পোঁচ খাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই তার।

কোরা বলল, 'তুমি যদি আমার একটা কাজ করে দাও তাহলে দশ মিনিটের জন্যে আমি শোক পালনে বিরতি দিতে পারি।'

'কি করতে হবে বলো। পারলে নিশ্চয়ই করব।'

'আমি রেমনের শরীরটা চাই। যাজকের প্রার্থনার পর চার্চের উঠানে ওকে কবর দেব। দ্বীপে ওর দেহটা আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' রামের নেশায় নির্দ্বিধায় মিথ্যে বলল ক্যালডন। একথাই মেয়েটা শুনতে চাইছে। রেমন যে এখন হাঙরের পেটে সেটা সে কোরাকে বলেনি, শুধু বলেছে আগন্তুকের হাতে রেমন খুন হয়েছে।

'আমার রেমনকে ওরা নিশ্চয়ই এখনও কবর দেয়নি?'

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

'না,' সত্যি কথাই বলল ক্যালডন।

'আমি চাই না অপরিচিত একদল মানুষ ওকে কবর দিক। আমি নিজে ওকে কবর দেব। আমাকে যদি দ্বীপে নিয়ে গিয়ে ওর দেহ বুঝিয়ে দাও তাহলে এখন যা ইচ্ছে করতে পারো আমাকে নিয়ে।'

রামের প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত দ্বিধা দূর হয়ে গেছে ক্যালডনের। কথা দিলেই তা রাখতে হবে এমন নয়। তাছাড়া মেয়েটার ওপর কড়া নজর রাখবে সেটা তো আগেই ঠিক করা হয়ে গেছে। কোরা কোনও ঝামেলা করতে পারবে না। পরেরটা পরে ভেবে দেখা যাবে। বলল, 'ঠিক আছে, কোরা, আমি রাজি। তোমাকে লুকিয়ে দ্বীপে নিয়ে যেতে হবে। ইউনিফর্ম পরিয়ে নিলে কেউ সন্দেহ করবে বলে মনে হয় না।'

'রেমনের দেহ পাওয়াটাই আসল, কিভাবে আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে সেটা তোমার ব্যাপার।' কাপড় সরানোর খসখস আওয়াজ হলো। ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল কটটা। ফিসফিস করে কোরা বলল, 'যা করার তাড়াতাড়ি করবে। আমি এখন পাপ করছি। আমার রেমন মরে গেছে আর আমি তোমার সঙ্গে ফুর্তিতে অংশ নিচ্ছি। তবে ভেবো না বিশ ডলার না দিয়ে তুমি চলে যেতে পারবে।'

হাসল ক্যালডন, মনে মনে পতিতাকে গালি দিচ্ছে। বিশ ডলারের একটা নোট ধরিয়ে দিল মেয়েটার হাতে। দু'মিনিট পর ব্যস্ত ক্যালডনকে জিজ্ঞেস করল কোরা, 'তোমার কি মনে হয় ওই লোকটার সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবে? যেলোকটা রেমনকে খুন করেছে?'

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল ক্যালডন। কোরা কথাটা না বললে মনেও আসত না তার। এখন মেয়েটা বলায় মনের মাঝে কে যেন বলছে আবার ওই দীর্ঘদেহী লোকটার সঙ্গে দেখা হবে। ফিরে আসবেই লোকটা। এখন মনে হচ্ছে ঘটনা মাত্র শুরু হয়েছে।

'হ্যাঁ, আবার ওর সঙ্গে দেখা হবে। অন্তত আমি চাই দেখা হোক। এবার আমি ওকে খুন করব।'

তাঁবুর ছাদটা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কোরা ল্যানযস ছাদের দিকেই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। কিছুই সে অনুভব করছে না। আর মাত্র কিছুক্ষণ, তারপরই শুয়োরটা তার গায়ের ওপর থেকে সরে যাবে।

'তুমি না,' বলল কোরা, 'আমি ওকে খুন করব। খুন করব রেমনের জন্যে।'

পাঁচ

গ্যালোস কে। তীর থেকে এক মাইলের সামান্য বেশি দূরে। ওই এক দেড় মাইল শান্ত সাগরে রানার জন্যে সাঁতরে পাড়ি দেয়া কোনও ব্যাপারই নয়, কিন্তু এখন প্রবল স্রোত আর ক্ষিপ্ত ঢেউয়ের কারণে ওর মনে হচ্ছে কোনদিনই আর গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না।

আধ ঘণ্টা হলো এক নাগাড়ে ঢেউ আর স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ও। গ্যালোস কে'র আলো দেখে বুঝতে পারছে আর দশ মিনিটের ভেতর দ্বীপটায় পৌঁছে যাবে। প্রহরী থাকবে নিশ্চয়ই সৈকতে। সাবধানে ওকে উঠতে হবে তীরে।

বিশ্রাম নিতে একটু থামল রানা, ট্র্যান্সমিটারের সুইচ অন করল, এবার অন্য ফ্রিকোয়েন্সিতে।

'কিরে?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'নেমেছি সাগরে,' জবাব দিল রানা।

'এক মিনিট ট্র্যান্সমিশন অন রাখ, তোর বেয়ারিংটা পেয়ে যাব।'

'রওনা হয়েছিস?'

'হয়েছি। বাংলার গৌরব থেকেই বলছি। সাগরের কি অবস্থা?'

আট ফুট উঁচু একটা ঢেউ রানার মুখে বাড়ি মেরে চলে গেল। নোনা পানি কুলি করে ফেলে দিয়ে বলল রানা, 'ভাল না রে। তবে গ্যালোস কে'র কাছাকাছি চলে এসেছি। ওভার।'

'কে. সি. রওনা দিলে যোগাযোগ করিস। চিনা জাহাজটা কোথায় থাকবে কিছু জেনেছিস? হারিকেনের মধ্যে আছি, বিশ ফুট সামনেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। ওভার।'

দু'মিনিট এক নাগাড়ে কথা বলে গেল রানা, জানাল কবীর চৌধুরীর সঙ্গেই চিনা জাহাজে ওঠার চেষ্টা করবে ও, সেখান থেকে ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে জানাবে কোন্দিকে চলেছে। বাংলার গৌরব ওর বেয়ারিং অনুযায়ী ইন্টারসেপ্ট করলে ঝামেলা হবার কথা নয়।

কথা শেষ করে ট্র্যান্সমিটারটা বন্ধ করে দিল রানা, আবার সাঁতার কাটতে শুরু করল। বেশির ভাগ ঢেউই দশ ফুটের চেয়ে কম উচ্চতার, খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না ওগুলোকে সামাল দিতে। একবার কম্পাস রিডিং নিল। ঠিক পথেই আছে। গ্যালোস কে তিন মাইল দীর্ঘ আর মাঝখানটা আধ মাইল চওড়া। দ্বীপের দু'পাশে তৈরি হয়েছে সরু ফানেল, চমৎকার প্রাকৃতিক বন্দর। দ্বীপের উত্তরদিকটা জংলা, চিরহরিৎ বন আর ঝোপ ঝাড়ের সমষ্টি। ওদিকে কবীর চৌধুরীর লোক না থাকারই কথা।

দ্বীপের দক্ষিণ দিকটা পাথর আর ঝোপঝাড়ের সমন্বয়। মাঝে মাঝে জন্মেছে লডউড, নারকেল গাছ, ঘন ফার্ন, স্প্যানিশ বেয়োনেট, পালমেটো আর আছে বুনো হেলিকোনিয়া—কলাগাছের খালাতো ভাই, তবে ফল ধরে না। পেছন দিকে কিছু মেহগনি গাছও আছে। ওগুলোকে জড়িয়ে রাখা আঙুরের গাছগুলো রানার কব্জির চেয়েও চওড়া। জায়গায় জায়গায় বালির বিস্তৃতি। এদিক দিয়ে উঠলেও ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। দ্বীপের মাঝখানটাই আসলে বিপজ্জনক। ওখানে টিলার মাথায় কবীর চৌধুরীর প্রাসাদে বাতি জ্বলছে, দেখতে পেল রানা। কবীর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা মনে আসতে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল ওর

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

মুখে।

ঢেউ এখন রানাকে এগোতে সাহায্য করছে, ঠেলছে একটা কোরাল রীফের দিকে। ওখানে বাড়ি খেয়ে ঘূর্ণি সৃষ্টি হচ্ছে, সাদা ফেনা তুলে ভেঙে যাচ্ছে ঢেউয়ের মাথাগুলো। স্রোতের টানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইচ্ছে করেই সামান্য দক্ষিণে সরল রানা, এড়িয়ে গেল কোরাল রীফ। রীফের পেছনে পানি অপেক্ষাকৃত শান্ত, এগোল সেদিকে। সৈকত আর একশো গজ দূরে।

ক্রল করে সৈকতে উঠল ও, কনুইয়ের সাহায্যে সামনে এগিয়ে চলল। এতই গাঢ় অন্ধকার যে সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বালিতে কান পেতে শুনল। মাঝে মাঝে দুয়েকটা কাঁকড়া বালি ঘষটে খসখস শব্দ করে গর্তে গিয়ে ঢুকছে, এছাড়া আছে বাতাস আর বৃষ্টির বিরতিহীন একঘেয়ে আওয়াজ।

থামল রানা, পরবর্তী দশ মিনিট মূর্তির মত পড়ে থাকল বালিতে। কান পেতে আছে, চোখ সইয়ে নিচ্ছে আঁধারে। তারপর আওয়াজটা শুনতে পেল। কে যেন পাথরে রাইফেলের বাঁট ঠুকেছে। খুব কাছেই কোথাও। বড়জোর বিশ গজ দূরে আছে লোকটা।

মুহূর্তের জন্যে বিস্ময় বোধ করল রানা। দ্বীপের এই নির্জন বিরান দক্ষিণ প্রান্তে গার্ড থাকার কারণ কি? মনে মনে গ্যালোস কে'র ম্যাপটা আরেকবার ঝালিয়ে নিল রানা।

দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে ভাঙা দুর্গের খুব কাছেই কোথাও আছে ও এখন। ভগ্নস্তূপে এখনও ফাঁসিকাঠ আছে কয়েকটা, সেই থেকে দ্বীপের এই নাম। দুর্গটা স্প্যানিশরা আঠারোশো আটানব্বুই সাল পর্যন্ত ব্যবহার করেছে। ততদিনে মানুষের মনোভাব পাল্টে গেছে, আগের মত জনসমক্ষে ফাঁসির রেওয়াজ উঠে গেছে, ফলে ফাঁসি অনুষ্ঠিত হতো লোকচক্ষুর আড়ালে, দুর্গের দুর্ভেদ্য দেয়ালের ভেতর।

ম্যাপে কালো একটা চারকোনা দাগের সাহায্যে দুর্গের অবস্থান বোঝানো হয়েছে। ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই নেই এখন, ইঁদুর আর ছোট ছোট বুনো প্রাণীর আস্তানা। তারপরও পাহারা বসানো হয়েছে এখানে। কেন?

কিছুক্ষণের জন্যে বাতাসের গতি কমে গেছে। বৃষ্টির তোড়ও আগের মত নেই। হারিকেন একটু বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে। আবার পাথরে রাইফেলের বাঁট ঠোকার আওয়াজ শুনতে পেল রানা। বিড়বিড় করে অভিযোগের সুরে কি যেন বলল লোকটা। রানা বুঝতে পারছে না লোকটা দুর্গ পাহারা দিচ্ছে নাকি সৈকত। কবীর চৌধুরী দ্বীপে অনাহুত অতিথি আশা করছে?

বাতাসে নাক তুলে গন্ধ শুঁকল রানা। ভাজা মাংস আর স্টুর গন্ধ আসছে ডানদিকে, দুর্গের কাছ থেকে। আবার বাতাসের ঝাপটা শুরু হয়ে যাবার আগের মুহূর্তে রানার মনে হলো একসঙ্গে অনেক মানুষের চাপা গলা শুনতে পেয়েছে ও আবছা ভাবে। দুর্গের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, একটা আলোও নেই কোথাও। গাঢ় অন্ধকার।

বাতাস যখন কম ছিল তখন একটা সিগারেট রোল করতে শুরু করেছিল প্রহরী, নতুন করে বাতাসের আক্রমণ আরম্ভ হওয়ায় তার হাত থেকে কাগজ আর তামাক উড়ে গেল। বৃষ্টি আর বাতাসের আওয়াজ ছাপিয়ে লোকটার গালি শুনতে পেল রানা। আস্তে ধীরে ক্রল করে গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে এগোতে শুরু করল ও।

কালোর ভেতর আরও কালো একটা আকৃতি চোখে পড়তে থামল রানা, সৈকতের বালি পেরিয়ে মসৃণ, ভেজা পাথরের ওপর চলে এসেছে। দুটো বোল্ডারের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, একটু কুঁজো হয়ে আছে, বোধহয় আবার সিগারেট তৈরির চেষ্টা করছে। প্রহরীর বারো ফুটের ভেতর চলে এসেছে রানা, আর সামনে বাড়তে সাহস পাচ্ছে না, নুড়ি পাথর থাকতে পারে, সামান্য আওয়াজ হলেও সতর্ক হয়ে যাবে লোকটা। হাতড়ে হাতড়ে মুঠোর সমান বড় একটা পাথর তুলে নিল রানা, স্কুবা ছোরাটা চলে এসেছে অপর হাতে। ছোরাটা পাথরের ওপর ঘষল রানা। লোকটা বোধহয় শুনতে পায়নি, নড়ল না। আবার গাল বকল গার্ড, সিগারেট তৈরি করতে অসুবিধে হচ্ছে। লোকটা এই বৃষ্টির মধ্যে সিগারেট ধরাবে কিভাবে ভেবে পেল না রানা।

ছোরাটা আবার ঘষল রানা। এবার গার্ড শুনতে পেয়েছে। জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

পাথরের মত স্থির হয়ে আছে রানা।

'কে ওখানে?'

ডানহাতে স্কুবা ছোরাটা বাগিয়ে ধরেছে রানা, থ্রোইং নাইফের মত করে ব্যবহার করার ইচ্ছে। পা ঘষটে এগিয়ে আসতে শুরু করল গার্ড, পাথরের সঙ্গে ঠোকর খেতে খেতে আসছে রাইফেলের বাঁট। একেবারেই অ্যামেচার। প্রফেশনাল হলে আওয়াজ শুনেই কাউকে জানাত।

একটা খালি পা রানার বামহাতে এসে লাগল। কোবরার মত ছোবল দিল রানা, গার্ডের পা আঁকড়ে ধরে এক ঝটকায় উঠে বসল, ছোরাটা আমূল ঢুকিয়ে দিল গার্ডের বুকে। ঝড়ো বাতাসের আওয়াজের নিচে চাপা পড়ে গেল গার্ডের মৃত্যুপূর্ব গোঙানি। দু'হাতে লোকটাকে ধরে আস্তে করে শুইয়ে দিল রানা পাথরের ওপর, শক্ত করে ধরে রাখল। কয়েকবার খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল শরীরটা।

লাশটা সৈকতে ফিরিয়ে আনল রানা, বালি খুঁড়ে কবর দিল। অল্প পানিতে নেমে গায়ে লাগা রক্তের ছিটে পরিষ্কার করে নিল। কুকুর থাকতে পারে। রক্তের গন্ধে ওগুলো সহজেই আকৃষ্ট হয়।

পাথরের ওপর বসে অন্ধকারে রাইফেলটা দক্ষ হাতে পরখ করে দেখল। পুরোনো একটা লী এনফিল্ড ওটা, এধরনের রাইফেল বাংলাদেশী পুলিস এখনও ব্যবহার করে। থ্রী নট থ্রী। এম কে ওয়ান। বল অ্যামুনিশ্যন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এটা ব্যবহার করে জার্মানদের বোকা বানিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশরা। দক্ষ লোকের হাতে পড়লে মারাত্মক একটা অস্ত্র। মাঝের আঙুলটা ট্রিগারে রেখে তর্জনী বোল্টের ওপর রাখলে মিনিটে চল্লিশটা করে গুলি ছোঁড়া যায়। রাইফেলটা পরখ শেষে সঙ্গে

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

নিয়ে ক্রল করে আবার ভাঙা দুর্গের দিকে এগোল রানা। বাতাসে ভাসছে ভাজা মাংসের জোর গন্ধ।

আসছি আমি, কবীর চৌধুরী, মনে মনে বলল রানা।

ছয়

রানার সঙ্গে যোগাযোগ হবার পর বাংলার গৌরবের রেডিয়োরুম থেকে বেরিয়ে ওয়ার্ডরুমে চলে এলো সোহেল। ওর জন্যে এ কামরাটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে বাংলাদেশ আর্মির দু'জন চৌকস সোলজার।

ঘরের ভেতর ওর অপেক্ষায় কয়েকজন আমেরিকান আর ব্রিটিশ এজেন্ট অপেক্ষা করছে। সোহেলকে ঢুকতে দেখে কৌতূহলী চেহারায় তাকাল তারা। কয়েকজনের হাতে কফির কাপ, সাদা উর্দি পরা স্টুয়ার্ড দিয়ে গেছে একটু আগে। সোজা একটা টেবিলের সামনে থামল সোহেল, ওটাকে ডেস্ক হিসেবে ব্যবহার করছে। কারও দিকে তাকাল না। ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। একটু পর নির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ না করে বলল, 'প্ল্যান বি কার্যকর হচ্ছে। রানা আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে না পারায় সরাসরি কবীর চৌধুরীর সঙ্গে সোনার খোঁজে যাবার চেষ্টা করবে। চিনা জাহাজটাকে আমরা চেষ্টা করব ইন্টারসেপ্ট করতে। যদি না পারি, তাহলে রানার সঙ্গে যোগাযোগ করে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করব।' সিআইয়ের এজেন্টদের দিকে তাকাল সোহেল। 'আপনারা চাইছেন কবীর চৌধুরীর সাহায্য নিয়ে পুয়ের্টো রিকো যাতে হাইতিতে বিপ্লব ঘটাতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে। রানার সঙ্গে যোগাযোগের পর ও কি করল তা জানা গেলে নিজেদের দায়িত্বে যা করার করবেন আপনারা, সৈন্য নামিয়ে দখল করে নেবেন কবীর চৌধুরীর আস্তানা। এখন থেকে দু'ঘণ্টা পর পর যোগাযোগ করবে রানা।'

সোহেলের বক্তব্য শেষ হবার পর কথা বলল না কেউ।

একটু পর রাডার রিপোর্ট এলো, এখনও স্ক্রিনে কোনও জাহাজের চিহ্ন নেই।

*

সামনে বাড়তে গিয়ে আরেকজন গার্ডকে খুন করতে হয়েছে রানার। লোকটা আকৃতিতে ওর সমানই হবে। পোশাকটা পরে নিয়ে কপালের ওপর ক্যাপ টেনে এনে দুর্গটা ও পায়চারি করে বেড়িয়েছে। এক ঘণ্টা হলো এখনও কেউ কিছু সন্দেহ করেনি।

রান্না, ঘুম আর আড্ডায় ব্যস্ত লোকগুলো। অন্তত তিনশো ভাড়াটে খুনী হবে, নানা অস্ত্রে সজ্জিত। একসঙ্গে এত রকমের অস্ত্র আগে কখনও দেখেনি রানা। নতুন গ্রেনেড; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিল্‌স্ বোম, কারবাইন, মাউজার, এনফিল্ড; ভিয়েতনামে ব্যবহার করা এম ১৪ আর এম ১৬; প্রাচীন ওয়াটার কূল্‌ড্ ব্রাউনিং মেশিনগান, বার্স, স্টেন, থম্পসন্স, বাযুকা–একটা নব্বুই ক্যালিবারের অ্যান্টি ট্যাঙ্ক রাইফেল–কি নেই। এমন কি কয়েকটা ফ্লেইম থ্রোয়ারও দেখতে পেয়েছে রানা। বিশাল একটা পাহাড়ী গুহায় আরও আছে নেট দিয়ে ঢাকা ছয়টা পিটি বোট। ওখানে পৌঁছোতে কোমর সমান উঁচু ঘাস পেরিয়ে আসতে হয়েছে ওকে, সাঁতরে ঢুকতে হয়েছে গুহায়। প্রহরী ছিল কয়েকজন, তাস পেটানোয় ব্যস্ত, কেউ টের পায়নি অনাহুত আগন্তুকের আগমন।

বিদ্যুতের ঝিলিকে পিয়ারের পাশে ভেড়ানো বোটগুলোকে প্রথম দেখতে পায় রানা। প্রহরীরা গুহার মুখের কাছে আছে দেখে আন্দাজ করেছে বোটগুলোতে প্রহরী থাকবে না। সতর্ক নজর রাখল আধঘণ্টা। কোনও আওয়াজ পাওয়া গেল না বোটগুলোর কাছে। সাঁতরে কাছে চলে গেল রানা, শুধু মাথার খানিকটা পানির ওপরে। এক নজরেই বুঝতে পারল এগুলো এলকো টাইপ বোট। মজবুত জিনিস, ঝড়ো সাগরেও নির্বিঘ্নে এগুলোর ওপর ভরসা করা যায়। দেখে যতই পুরনো মনে হোক জিনিসগুলো নির্ভরযোগ্য। কবীর চৌধুরী নিশ্চয়ই রিকন্ডিশন করেছে ওগুলোকে।

যেটাতে সুন্দর রং করা ওটাকেই ফ্ল্যাগ শিপ মনে হলো রানার, নেট তুলে ডেক টপকে এঞ্জিন রুমে চলে এলো ও। ট্র্যান্সমিটারের সুইচ অন করল। নীরবতায় মৃদু খড়খড় শব্দও অস্বাভাবিক জোরাল শোনাল। এক মুহূর্ত পর থামল আওয়াজটা।

নিচু গলায় বলল রানা, 'রানা বলছি, ওভার।'

'বল্,' ভেসে এলো সোহেলের যান্ত্রিক গলা।

'ছয়টা বোট নিয়ে হাইতি আক্রমণ শুরু করবে কবীর চৌধুরী, সিআইএ-র এজেন্টকে জানিয়ে দে নিজেদের সৈন্য নিয়ে যাতে ওগুলো আক্রমণ করে দখল করার ব্যবস্থা করে। তবে আমি রওনা হওয়ার আগে পর্যন্ত যেভাবে হোক ওদের ঠেকিয়ে রাখবি। তোদের রাডার স্ক্রিনে কোনও জাহাজের দেখা পেলি?'

'না। হারিকেনের কারণে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।'

'তিনশো লোক আছে কবীর চৌধুরীর সেটা ওদের বলিস। সহজ হবে না এদের বাগে আনা।'

'ওরা প্লেন থেকে মেরিন নামাবে ঠিক করেছে। কয় ঘণ্টা সময় চাইব ওদের কাছে?'

'পিটি বোটগুলো রওনা হওয়ার আগে পর্যন্ত কিছুই নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না। তবে সম্ভবত আজকেই আসছে চিনা জাহাজ। কবীর চৌধুরী দেরি করবে বলে মনে হয় না। ভোর পর্যন্ত ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলে আমার মনে হয় যথেষ্ট হবে।'

'তাহলে এই কথাই রইল। আর কিছু?'

'তেমন কিছু না। শুধু নীলাকে আমার তরফ থেকে ঠোঁটে একটা চুমু দিস, আমি কিছু মাইন্ড করব না।'

'তবে রে, শালা, এমন ভয়ঙ্কর অ্যাসাইনমেন্টেও ফাজলামি? দাঁড়া বস্‌কে যদি

www.MurchOna.com

রিপোর্ট না করি!'

'রাখি সোহেল, এবার কবীর চৌধুরীর আসল আস্তানায় ঢোকার চেষ্টা করব। ওভার।'

'সাবধানে থাকিস। ওভার।'

আবার খড়খড় করছে ট্র্যান্সমিটার। সুইচ অফ করে দিল রানা, নেট সরিয়ে বোট থেকে নিঃশব্দে নেমে সাঁতরে বেরিয়ে এলো গুহা থেকে, চলে এলো যেখানে প্রথমে তীর থেকে উঠেছিল।

আরেকবার দুর্গটা চক্কর মেরে দেখে নিয়ে দ্বীপের মাঝ বরাবর রওনা দিল ও, ভিলার উঠানের কাছে পৌঁছোতেই কুকুরগুলো ছায়ার মত নিঃশব্দে ধেয়ে এলো। একটা দুটো নয়, একসঙ্গে দশ বারোটা খুনে ডোবারম্যান পিনশার। একমাত্র কতর্ব্যটাই পালন করল রানা, রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে ঝেড়ে দৌড় দিল। সামনে কি আছে দেখতে পাচ্ছে না। যখন হড়াস করে গর্তটায় পড়ল তখনও বুঝে উঠতে পারল না কি হলো। দশ ফুট নিচু গর্তটা আখ আর পাম গাছের পাতা দিয়ে ঢাকা ছিল। পড়ার সময় একটা তারে পা লাগল ওর, শকুনের বাচ্চার মত তীক্ষ্ণ চিৎকার শুরু করল কয়েকটা সাইরেন। গোড়ালির ব্যথা সত্ত্বেও মুহূর্তে বুঝে ফেলল রানা, ওর উপস্থিতি আর গোপন নেই, এখনই ধরা পড়ে যাবে ও। গর্ত ঘিরে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড হাঁক ছাড়তে শুরু করেছে কুকুরগুলো।

দেড় মিনিটের মাথায় কুকুরগুলোকে সরিয়ে নেয়া হলো, গর্তের কিনারায় এসে দাঁড়াল পনেরোজন প্রহরী, প্রত্যেকের হাতে উদ্যত টমিগান। একটা দড়ির মই ফেলা হলো নিচে, সুবোধ বালকের মত ওপরে উঠে এলো রানা। সার্চ করে ওর ছোরা আর ট্র্যান্সমিটার কেড়ে নেয়া হলো, ঠেলা ধাক্কা দিয়ে নিয়ে আসা হলো একটা পাতাল ঘরে। জেলের সেল মনে করার কোনও কারণ নেই ঘরটাকে। অ্যাটাচড্ বাথ, মেঝেতে পুরু কার্পেট, দেয়ালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দুর্লভ ছবি–রীতিমত বিলাস বহুল ঘর।

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল। বাইরের প্যাসেজেও পুরু কার্পেট পাতা, ফলে পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি ও। দরজা খুলে যেতে উঠে দাঁড়াল, দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছে গোমড়া মুখো অস্ট্রেলিয়ানটা। এই লোকই মদ খেয়ে সৈকতে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, কোরা ল্যানয়সকে লেলিয়ে দিয়ে ধরতে চেয়েছিল ওকে। এখনও তার পরনে সেই একই পোশাক, মাথায় বুশ হ্যাট। এখন অবশ্য বুশ জ্যাকেটটা কাদা মাখা, শর্টস কুঁচকে আছে; কিন্তু একটু আগে শেভ করেছে সে, বোধহয় কবীর চৌধুরীর সামনে যেতে হবে বলে। রানার দিকে পা বাড়িয়ে ভয়ালদর্শন রিভলভারটা বের করল সে। রানার নাকে ভক করে এসে লাগল কড়া রামের বিশ্রী দুর্গন্ধ।

রিভলভার নাড়ল ক্যালডন, এক পাশে সরে দাঁড়াল। 'বস্ ডেকেছেন তাঁর স্টাডিতে। কোনও চালাকি নয়, আগে বাড়ো।'

'আবার তাহলে দেখা হলো,' পা বাড়িয়ে বলল রানা।

মাথা নাড়ল ক্যালডন। লালচে চোখে রানাকে কড়া দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বলল, 'ভুল বকছ তুমি। জীবনে আমি আগে দেখিনি তোমাকে কখনও। কোনও ফন্দি থাকলে ভুলে যাও। পা চালাও শীঘ্রি, মিস্টার চৌধুরী অপেক্ষা করতে পছন্দ করেন না।'

লোকটার চোখে মুহূর্তের জন্যে পরিচয়ের ছাপ ফুটে উঠতে দেখেছে রানা। আরও একটা জিনিস ছিল তার চাহনিতে। অস্বস্তি। কোনও কারণে লোকটা চাইছে না আগে ওদের দেখা হয়েছে সেটা প্রকাশিত হোক। অস্ট্রেলিয়ানটার আচরণের একটা কারণই খুঁজে পেল রানা, বলল, 'ঠিকই বলেছ তুমি। ক্ষণিকের জন্যে বোকা হয়ে গিয়েছিলাম তোমাকে দেখে, মনে হচ্ছিল আমার পরিচিত একজন, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ভুল করেছি।'

শীতল হাসল ক্যালডন।

দরজা পার হবার পর আরও দু'জন গার্ড পিছু নিল ওদের, দু'জনের হাতেই টমিগান।

'আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে,' নিচু স্বরে বলল ক্যালডন, 'নিজের হাল নিয়ে চিন্তা করো। তোমার জায়গায় আমি হলে এতক্ষণে প্যান্টে পেশাব করে দিতাম।'

একটা সিঁড়ির গোড়ায় চলে এলো ওরা। বাঁকা হয়ে ওপরে উঠে গেছে সিঁড়ি। ওপরে উঠতে শুরু না করে পাশের একটা দরজা খুলে রানাকে ইশারা করল অস্ট্রেলিয়ান মেজর। 'ভেতরে ঢোকো, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।' গার্ডদের হাতের ঝাপটায় বাইরে অপেক্ষা করতে বলে রিভলভারটা রানার দিকে তাক করল সে। 'ঢোকো। কোনও চালাকি নয়।'

দীর্ঘ একটা সরু ঘরে প্রবেশ করল রানা। পুরো ঘরটা মজবুত কংক্রিটে তৈরি, সিলিং থেকে ঝুলছে কয়েকটা হাজার ওয়াটের বাল্‌ব, উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ঘরের শেষ প্রান্তে দ্রুত নড়ছে কয়েকটা টার্গেট। শ্যুটিং গ্যালারি। প্র্যাকটিস রেঞ্জ। বাতাসে ভাসছে পোড়া করডাইটের গন্ধ। একটু আগেই এখানে কেউ প্র্যাকটিস করছিল।

জীবন্ত টার্গেটে, বুঝতে পারল রানা। দুটো খুঁটির সঙ্গে লটকে আছে কবীর চৌধুরীর অবাধ্য দুই মার্সেনারি, চিবুক ঠেকে আছে তাদের রক্তাক্ত বুকের সঙ্গে।

'ওরা নির্দেশ অমান্য করেছিল,' বলল ক্যালডন নির্বিকার কণ্ঠে। 'বস্ অবাধ্যতা একদম সহ্য করতে পারেন না। এদের দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সামনে কি আসছে?'

গার্ডটা দরজার বাইরে, কথা শুনতে পাবে না, জিজ্ঞেস করল রানা, 'ঠিক কতটা বিপদে পড়েছি আমি?'

'যতটা বিপদে পড়া সম্ভব। আমার আন্দাজ যদি সঠিক হয় তাহলে আমাদের মাঝে বড়জোর আর এক ঘণ্টা বিচরণ করবে তুমি।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে লাশ দুটো দেখছে রানা, অস্ট্রেলিয়ান মেজর কাছে এসে ওর কিডনিতে রিভলভারের নল দিয়ে খোঁচা মারল, রামের বোটকা গন্ধ ভরা মুখটা রানার কানের কাছে এনে বলল, 'আমরা কিন্তু পরস্পরকে আগে কখনও দেখিনি

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike
www.MurchOna.com

সেটা মনে রেখো। সৈকতে দেখা হওয়ার কথা ভুলে যাও। আমার কথা শুনলে চেষ্টা করে দেখব কি করতে পারি। হয়তো তোমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারব। ঠিক আছে? বুঝেছ আমি কি বলেছি?'

'বুঝেছি,' বলল রানা, মনে মনে বলল, 'কবীর চৌধুরী আমাকে দেখলে আমি শেষ, সেক্ষেত্রে তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাব আমি, বদের হাড্ডি!'

রানাকে সামনে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল ওরা, চমৎকার করে সাজানো একের পর এক করিডর পেরিয়ে চলল। কয়েকটা দরজা পার হলো। প্রত্যেকটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র প্রহরী। যে দরজাগুলো খোলা দেখল সেগুলোর ভেতরে টেবিলে বসে কাজ করছে লোকজন, ম্যাপ দেখছে গভীর মনোযোগে, চার্ট তৈরি করছে–প্রত্যেকের পরনে সবুজ ইউনিফর্ম, কাঁধে পদমর্যাদাসূচক ইনসিগনিয়া।

'ছোটখাটো একটা সেনাবাহিনী,' মন্তব্য করল রানা।

রিভলভার দিয়ে ওর পিঠে জোরাল এক গুঁতো মারল ক্যালডন। 'চুপ! একদম চুপ! একটা কথাও না।' রানা বুঝতে পারল গার্ডদের সামনে কঠোরতা দেখাচ্ছে লোকটা।

বিশাল একটা ওক কাঠের দরজার সামনে থামল ওরা। নক না করেই রানাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল ক্যালডন, দরজাটা পেছনে বন্ধ করে দিল। চট করে গার্ডদের অবস্থান দেখে নিল রানা, হাসি হাসি চেহারা করে অপেক্ষাকৃত তরুণ গার্ডকে বলল, 'সিগারেট হবে একটা?'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বাড়িয়ে দিচ্ছিল তরুণ প্রহরী, কিন্তু পাশেরজন হাতের ঝাপটায় প্যাকেটটা ফেলে ঘোঁৎ করে উঠল। 'গাধা নাকি! বস্ জানলে খুন হয়ে যাবে।'

দুঃখিত চেহারা করল রানা। মনে মনে ভাবছে আসলেই পাগল বৈজ্ঞানিককে যমের মত ভয় পায় তার লোকরা।

অস্ট্রেলিয়ান মেজর বেরিয়ে এসেছে। রানাকে হাতের ইশারা করল। 'ভেতরে যাও, বস্ ডাকছেন। চালাকির চেষ্টা কোরো না। কোনও জানালা নেই ওঘরে, এই দরজা ছাড়া বেরোবার কোনও পথ নেই। আর বাইরে আমরা পাহারায় থাকছি।'

শীতল হাসল রানা। 'তোমাদের বসের কোনও ক্ষতি করে দিতে পারি আমি সে-ভয় পাচ্ছ না?'

রানাকে আপাদমস্তক দেখল ক্যালডন, চোখে অবহেলার দৃষ্টি ফুটে উঠল। 'তুমি স্বয়ং শয়তান হলেও বোধহয় আশঙ্কা করতাম না।'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল রানা। ঘরটা গোলাকার, বিশাল; বিলাসবহুল আসবাবপত্র, সুরুচির সঙ্গে সাজানো। মেঝেতে দামী কার্পেট, দেয়ালে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য পেইন্টিং। ছাদে বসানো কোমল আলোগুলো সরাসরি চোখে এসে লাগছে না, কেমন একটা মোহময় আবহ তৈরি করেছে। বাতাসে ভাসছে বিখ্যাত বাদক ভিভালডির বেহালার মিষ্টি মৃদু সুরলহরী।

'রানা!' বিশাল ডেস্কের পেছনে সিধে হয়ে বসল কবীর চৌধুরী। বিস্ময় কাটিয়ে দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। 'তাহলে দেখা হলো আবার। বোসো, রানা, বোসো। আমি তোমাকে আশা করিনি।'

মৃদু আলোয় চোখ সইয়ে নেয়ার ফাঁকে এগিয়ে গিয়ে চামড়া মোড়া চেয়ারে বসল রানা, সরাসরি কবীর চৌধুরীর চোখের দিকে তাকাল। 'কবে হুঁশ হবে তোমার, চৌধুরী? দেশের সঙ্গে বেঈমানী করে নিজেকে মানুষ ভাবো কি করে? ঘৃণ্য একটা কীট তুমি। তুমি...'

'হয়েছে, রানা, হয়েছে,' হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল কবীর চৌধুরী, আরেক হাত ডেস্কের ওপর তুলে আনল। সে হাতে একটা ল্যুগার পিস্তল, সরাসরি রানার বুক লক্ষ্য করে ধরা। 'তোমার এসব সস্তা আদর্শের কপচানি আগেও বহুবার শোনার দুর্ভাগ্য হয়েছে আমার। আমার আদর্শ কি জানো? যার শক্তি আছে, যার বুদ্ধি আছে, যে যোগ্য, যার প্রতিভা আছে; দুনিয়া তার জন্যে খোলা। সে নিজের জন্যে যা প্রয়োজন তা করবে, সাধ্য থাকলে জয় করে নেবে পৃথিবী। চেষ্টা তো অন্তত করবেই। সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে নিজেকে আমি বঞ্চিত করব কেন? এই যেমন তুমি...কি পেয়েছ তুমি দেশের কাছ থেকে? সামান্য বেতন...আর? জীবনের ঝুঁকি নিয়েছ, দেশকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছ, তার বিনিময়ে বেতনটা কি যথেষ্ট?'

হাসল রানা। 'তোমার পাগলামি আজও গেল না কবীর চৌধুরী। মানুষ হতে পারলে না, চিরটা কাল জানোয়ারই রয়ে গেলে।'

টকটকে লাল হয়ে উঠল কবীর চৌধুরীর চেহারা, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'অনেক আগে থেকে আঠার মত আমার পেছনে লেগে আছ তুমি। বারবার আমার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছ, বারবার মস্ত ক্ষতি করে দিয়েছ আমার। সারাজীবনে মূল্যবান যেসব কাজ করেছি তার সত্তর ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে তোমার জন্যে। এখন আমি জানি কি কারণে ক্ষতি হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অভাব ছিল আমার। সেটা এবার আমি অর্জন করে নেব। এমন ব্যবস্থা নেব যে তোমার মতো লোকরা আমার ধারেকাছে আসতে পারবে না।' থামল কবীর চৌধুরী, গম্ভীর চেহারায় রানাকে কিছুক্ষণ দেখল একদৃষ্টিতে, তারপর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সত্যি বলছি, রানা, ভেবে এসেছি নিজের হাতে তোমাকে খুন করতে পারলে স্বস্তি পাব। কিন্তু এখন কি মনে হচ্ছে জানো? আমার হাতে মরার যোগ্যতা তোমার নেই। যেভাবে উজবুকের মত ধরা পড়লে...তোমার কাছ থেকে আরও ভাল কিছু আশা করেছিলাম আমি। সেজন্যেই সিদ্ধান্ত পাল্টেছি। সাধারণ এক মদ্যপের হাতে তোমাকে মরতে হবে। বলো এরচেয়ে বেশি অপমান তোমাকে আমি কিভাবে করতে পারি?'

হাসছে কবীর চৌধুরী, চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম জ্বলজ্বল করছে। 'কি করতে যাচ্ছি, জানো, রানা? হাইতি দখল করে পুতুল সরকার বসাব। দু'দেশে, পুয়ের্টো রিকো আর হাইতিতে গড়ে তুলব আমার স্বপ্নের ল্যাবরেটরি। ঠেকাতে পারবে না তোমরা কেউ। এবার নিজের একটা বিরাট বাহিনী থাকবে আমার। তোমার দুর্ভাগ্য যে আমার বিজয় দেখে যেতে পারবে না।'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

'প্রলাপ বকছ তুমি, কবীর চৌধুরী। শেষে দেখবে লেজ গুটিয়ে পালাতে হবে তোমাকে।'

থমথম করছে কবীর চৌধুরীর চেহারা। আস্তে করে মাথা দোলাল। 'আমাকে ঠেকাতে পারবে না দুনিয়ার কেউ। আমি যখন তৈরি হবো তখন মাফিয়াকে মনে হবে বাচ্চা ছেলেদের দল। চাপের মুখে আমার অধীনে চলে আসতে বাধ্য হবে ওরা। সবগুলো অপরাধী সংগঠনের ওপর আধিপত্য স্থাপন করব আমি। শুনে মনে হচ্ছে পাগলের প্রলাপ, রানা? না, রানা, আমি যা বলছি তা বছর পাঁচেকের মধ্যেই ঘটবে। কে কে-এর নাম শুনলে পাতলা পায়খানা করে দেবে যেকোন দেশের পুলিস।'

চুপ করে আছে রানা, দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে সামনে ভিনগ্রহের আজব প্রাণী দেখছে। কোনও মন্তব্য করল না।

আবার শুরু করল কবীর চৌধুরী। 'ডোনা ডানের কাছ থেকে কি জেনেছ তুমি, রানা?'

শ্রাগ করল রানা। 'জানতে আর পারলাম কই, তার আগেই তো ওকে খুন করালে।'

'খায়রুল বেশ মুষড়ে পড়েছে,' স্বগতোক্তি করল কবীর চৌধুরী। 'ওর ইচ্ছে ছিল নিজের হাতে ডাইনীটাকে শেষ করবে।'

চুপ করে আছে রানা। একদৃষ্টিতে রানাকে দেখছে কবীর চৌধুরী, যেন ওর ভেতর দিয়ে দূরে কোথাও তাকিয়ে আছে। কিন্তু রানা একটু নড়তেই পিস্তলটা ওর বুক অনুসরণ করল। অধৈর্য বোধ করছে রানা। সময় বয়ে যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণ পর সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগের কথা। যোগাযোগ না হলে সোহেল বুঝে নেবে বিপদে পড়েছে ও।

অবশেষে ডেস্কের একটা বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী। ভারী ওক কাঠের দরজাটা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল জোসেফ ক্যালডন, হাতে রিভলভার, তাক করে রেখেছে রানার দিকে।

'ওকে বাইরে গার্ডের হাতে দিয়ে এসো,' বলল কবীর চৌধুরী, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'জ্বী, স্যার!' খটাস করে পা ঠুকল ক্যালডন। রানাকে হাতের ইশারায় দরজার দিকে এগোতে বলে পাশে সরে দাঁড়াল। বাইরে ওকে নিয়ে এসে গার্ডদের দ্রুত স্প্যানিশে কড়া নির্দেশ দিল সে যাতে মুহূর্তের জন্যেও রানার ওপর থেকে অস্ত্র না সরায়। গার্ডরা রানাকে দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। টমিগান তাক করে রাখল ওর পিঠের দিকে। সন্তুষ্ট হয়ে এবার ক্যালডন ফিরল কবীর চৌধুরীর অফিস ঘরে, ভেতরে ভেতরে কাঁপছে সে, ঘামছে দরদর করে।

কথা না বলে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল কবীর চৌধুরী, তারপর লোকটাকে অস্বস্তির চরমে পৌঁছে দিয়ে জানতে চাইল, 'কতদিন হলো তুমি আমার কাজ করছ, ক্যালডন?'

'প্রায় দু'বছর, স্যার।'

'হুম। ঠিক বলেছ। এরমধ্যে কতবার তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি, ক্যালডন?'

'আমি...মনে নেই, স্যার।'

'এত বেশি বার যে মনে থাকার কথাও নয়।' ভ্রূ কোঁচকাল কবীর চৌধুরী। 'মাতলামো, গায়ে পড়ে গোলমাল, না বুঝে কাজ করে বসা...তবে তোমার শেষের কাজটা আর সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে।'

ঘামছে ক্যালডন। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজাল। 'আমি ঠিক বুঝছি না, স্যার, আপনি কি বলতে চাইছেন।'

স্কুল পালানো বাচ্চাকে অভিভাবকরা যেচোখে দেখেন সেভাবে তাকে দেখল কবীর চৌধুরী, আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'ক্যালডন, ক্যালডন, মিথ্যে বলে কোনও লাভ নেই। ওই মেয়েটা, কোরা ল্যানযস; ওকে আমি ডেকে আনিয়েছি। শুনলাম রানাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছিলে তুমি, তোমার হাত ফস্কে বেরিয়ে গেছে সে। সেজন্যে তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারি, কারণ তোমার জানার কোনও উপায় ছিল না সে কে, কিজন্যে এসেছে। তাছাড়া আমার এলাকায় কোনও ঝামেলা না করার নির্দেশটাও তোমার স্বপক্ষে যায়। কিন্তু মিথ্যে বলেছ তুমি, ক্যালডন। রিপোর্ট করোনি। আবার মদ খেতে শুরু করেছিলে। এখনও তুমি মদ খেয়ে এসেছ। মদ পেলে আর হুঁশ থাকে না, না?'

অনেকবার কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হয়েছে ক্যালডন আর্মি-জীবনে। কয়েকবার তাকে পদচ্যুত হতে হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই নেশা কাটলে পদ ফিরে পেয়েছে সে, কারণ সে ছিল সত্যি ভাল যোদ্ধা। কোর্ট মার্শালের ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তার। মাঝে মাঝে অফিসারদের হাতে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ সুফল বয়ে আনে। মনে মনে কোরা ল্যানযসকে অভিশাপ দিয়ে পতিতাদের দোজখে নিয়ে ফেলল ক্যালডন। তীরে নেমেই মেয়েটা অন্ধকারে সটকে পড়ল। সরাসরি কবীর চৌধুরীর সঙ্গে এসে দেখা করেছে। মরুক হারামজাদী!

জুয়াটা খেলবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ক্যালডন। বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে বলল, 'জ্বী, স্যার, আমি দোষী। লোকটাকে হাতে পেয়েও গণ্ডগোল করে ফেলেছি।'

'তুমি রিপোর্ট করলে আমি অন্য পদক্ষেপ নিতে পারতাম। তাহলে আজকে আমাকে দুশ্চিন্তায় পড়তে হোত না।' ল্যুগারটা ক্যালডনের বুকে তাক করল বৈজ্ঞানীক। 'বলো, কেন আমি তোমাকে গুলি করব না?'

'আমি দুঃখিত, স্যার। এমন ভুল আর কখনও হবে না।'

ফোঁশ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল কবীর চৌধুরী। 'বেশ, ক্যালডন, শেষবারের মত তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি। এবার যে দায়িত্বটা দেব সেটা ঠিক মত পালন করতে ভুল কোরো না। রানাকে খতম করে দেবে। তার আগে ওকে মানসিক ভাবে দুর্বল করে তুলবে।' ঘড়ির দিকে তাকাল চৌধুরী। 'এক ঘণ্টার বেশি সময় নেবে না। ঠিক এক ঘণ্টা পর আমি শুনতে চাই রানা মারা গেছে।

www.MurchOna.com

যাও।'

স্বস্তিতে ছেয়ে গেল ক্যালডনের বুক। ভেতরে ভেতরে এখনও কাঁপছে সে। হড়বড় করে বলল, 'ধন্যবাদ, স্যার। এবার আর ভুল হবে না। আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন, স্যার।'

সে দরজার কাছে চলে গেছে, পেছন থেকে কবীর চৌধুরী বলল, 'মনে রেখো, এটাই তোমার শেষ সুযোগ।'

অস্ট্রেলিয়ান চলে যাবার পর টেবিলে একটা বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী, দেয়ালের গায়ে লাগানো একটা বুক শেলফ সরে গেল, পেছনে দেখা গেল ছোট একটা ঘর। ঘরে প্রহরাধীন দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে।

'ওকে আসতে বলো,' নির্দেশ দিল কবীর চৌধুরী।

ধাক্কা দিয়ে মেয়েটাকে সামনে ঠেলল গার্ড। একটা চেয়ার দেখাল বিজ্ঞানী। 'ওখানে বসো।' গার্ডের উদ্দেশে বলল, 'তুমি ওখানেই থাকো। দরকার হলে জানাব।'

আস্তে করে মাথা দোলাল গার্ড, মুখের সামনে বুক শেলফ সরে আসায় তাকে আর দেখা গেল না।

স্থির দৃষ্টিতে কোরাকে দেখল কবীর চৌধুরী, মনে মনে ভাবছে মেয়েটা দায়িত্ব পালন করতে পারবে কিনা। দেখা যাক।

'হাতে বেশি সময় নেই আমার,' বলল গুরুগম্ভীর স্বরে। 'তুমি কি এখনও প্রতিশোধ নিতে চাও?'

'চাই।' ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছে কোরার দু'চোখ। সবুজ রঙের বিরাট ইউনিফর্মে অদ্ভুত লাগছে মেয়েটাকে দেখতে।

'রানা মেরেছে তোমার রেমনকে। আর ওর মৃতদেহ দেবার কথা মিথ্যে বলেছে ক্যালডন। দু'জনের ওপরই প্রতিশোধ নিতে চাও?'

'চাই। শুয়োর ওরা দুটো।'

'তাহলে মন দিয়ে শোনো। মিনিট খানেক পরে একজন গার্ড তোমাকে নিয়ে যাবে। কিছু যন্ত্রপাতি দেবে তোমাকে। ব্যবহার শিখিয়ে দেবে। সহজ কাজ। ট্রিগার টানা ছাড়া আর কিছুই করতে হবে না তোমাকে। কি মনে করো, পারবে?'

চোখের ওপর থেকে চুল সরাল কোরা। 'আমি পিস্তল চালাতে পারি না, সেনোর। একটা ছুরি হলে...'

'পিস্তল চালাতে হবে না তোমাকে। পরে বুঝতে পারবে। খুব সহজ হবে কাজটা। যদি সফল হও তাহলে আমি দেখব পরবর্তীতে তোমার যাতে কোনও অসুবিধে না হয়।'

'এক্ষুণি আমি ওদের শেষ করতে চাই।'

বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী। গার্ড বেরিয়ে এলো বুক শেলফকে পাশ কাটিয়ে। দ্রুত কণ্ঠে তাকে নির্দেশ জানাল পাগল বিজ্ঞানী। গার্ড আর কোরা চলে যাবার পর ঘড়ির দিকে তাকাল। ক্যালডন যাবার পর মাত্র দশ মিনিট পার হয়েছে। ঠিক সময় মতই ঠিক কাজ হবে, একই সঙ্গে খুন হয়ে যাবে ক্যালডন আর রানা। আস্তে করে মাথা নাড়ল কবীর চৌধুরী। রানাকে মারতে খারাপই লাগছে। লোকটা যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

ম্যাপের দিকে তাকাল সে। হাইতির জায়গায় একটা বাতি জ্বলে উঠল। হাতে বেশি সময় নেই, অপারেশন শুরু করতে হবে। আশা করা যায় হাইতির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র নাক গলাবে না। একটা ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল সে, সরকারী একজন কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করবে।

*

পেছনে অস্ট্রেলিয়ান মেজরের বুটের খটখট আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা, মুক্তির পথ খুঁজছে, বুঝতে পারছে দ্রুত শেষ হয়ে আসছে সময়। অস্ট্রেলিয়ানের চেহারাই ঘরের ভেতরে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটা বোঝার জন্যে যথেষ্ট।

দীর্ঘ করিডর ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা, তারপর কংক্রিটের একটা র‍্যাম্প ধরে নিচের দিকে এগোল, ভিলার নিচে পৌঁছে যাচ্ছে। করিডর শেষ হয়ে গেছে, শুরু হলো সরু একটা টানেল। ছাদে ঝুলছে কম পাওয়ারের ন্যাংটো বাতি, আবছায়া তৈরি করেছে। ক্যালডনের বুটের নেইল মেঝেতে কট্‌কট্‌ আওয়াজ করছে। পেছনে তাকাল রানা। ক্যালডন নিজের কাজ ভাল বোঝে, দশ ফুট পেছনে আসছে লোকটা, ওর আওতার বাইরে।

কাঠের একটা দরজার সামনে এসে টানেলটা শেষ হয়েছে। পেছন থেকে ঘেউ করে উঠল ক্যালডন। 'দরজা খুলে ভেতরে ঢোকো। দরজা খোলাই রাখবে, যাতে আমি তোমাকে দেখতে পাই। কোনও চালাকি নয়।'

নির্দেশ পালন করল রানা, সময় পাওয়ার জন্যে কথা বলতে শুরু করল। ঘরের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের চুক্তির কি হবে? কবীর চৌধুরীকে আমি তোমার ব্যাপারে কিছুই বলিনি।'

প্রতিটি মুহূর্ত এখন গুরুত্বপূর্ণ। একটু বেশি বাঁচা মানেই আত্মরক্ষার একটা সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা।

হাসল ক্যালডন নোংরা দাঁতগুলো বের করে। 'দুঃখিত, কোনও চুক্তি হবে না আর তোমার সঙ্গে। কবীর চৌধুরী এমনিতেই সব জেনে গেছে। আমার কপাল ভাল যে ক্ষমা করে দিয়েছে, নাহলে তোমার মত একই পরিণতি হতো আমারও।'

ঘরের ভেতর চোখ বুলাল রানা। আসবাবপত্র বলতে কিছু নেই স্ট্র্যাপ লাগানো ভারী একটা চেয়ার ছাড়া। চেয়ারটার আকৃতি অনেকটা ইলেকট্রিক চেয়ারের মত। কিন্তু তারের কোনও সংযোগ নেই। চেয়ারের পায়ের কাছে জমাট রক্তের কালচে দাগ দেখল রানা। কেউ একজন মুছেছে, কিন্তু পুরো পরিষ্কার করেনি জায়গাটা।

'চেয়ারটায় বসো,' নির্দেশ দিল ক্যালডন।

বসল রানা। দরজার ভেতরে ঢুকে দু'কদম এগিয়ে থামল ক্যালডন, ভারী রিভলভারটা তাক করল রানার বুকে। জিজ্ঞেস করল, 'চেয়ারের ইতিহাসটা জানতে চাও?'

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

'তেমন একটা কৌতূহল বোধ করছি না,' জবাব দিল রানা। গলা শুকিয়ে গেছে ওর, বুঝতে পারছে উদ্যত অস্ত্রের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া বাঁচার আর কোনও উপায় নেই।

'তবু জেনে রাখা ভাল,' খুশি খুশি গলায় বলল ক্যালডন। 'চেয়ারটা এসেছে ভাঙা দুর্গের ডানজন থেকে। স্ট্র্যাপগুলো দেখেছ? ওগুলো দিয়ে বন্দির হাত-পা বেঁধে লোহার একটা কলার পরানো হতো গলায়, আস্তে আস্তে স্ক্রু টাইট দিয়ে বন্দির শ্বাস রোধ করে মারা হতো। নির্মম ধীর মৃত্যু, কি বলো? তোমার কপাল ভাল যে এক গুলিতে চট করে মরে যাবার সুযোগ পাচ্ছ।'

শরীরের সমস্ত পেশী শিথিল করে দিল রানা, ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে দেহটাকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে। পেটের ভেতর শিরশির করছে ওর, বুঝতে পারছে বিরাট ঝুঁকি নিচ্ছে, বাঁচার আশা নেই বললেই চলে।

ও মরে যাবে আর সামনে দাঁড়ানো এই লালমুখো মাতাল বাঁদরটা বেঁচে থাকবে ভাবতেই অন্তরে বিতৃষ্ণা অনুভব করল রানা। বুঝতে পারছে লোকটা আর ফুট দুয়েক সামনে থাকলে সুবিধে হতো।

মরণ-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে এক পায়ের ওপর আরেক পা তুলে দিল রানা, ভাব দেখে মনে হলো এখনই চাকরকে ডাক দিয়ে পাইপ আর স্লিপার আনতে বলবে।

'বিরাট ভুল করছ তুমি,' বলল ও। 'কবীর চৌধুরী তোমাকেও ছাড়বে না। তারচেয়ে আমাকে মুক্ত করে দাও, শেষ পর্যন্ত আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারব।'

ঘড়ি দেখল ক্যালডন। 'বলে যাও, মরার ভয় কমবে। আমাদের হাতে আরও বেশ কিছু সময় আছে। কিছু জানতে চাও? জানতে ইচ্ছে করছে না কেন তোমাকে আমি চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে শ্বাস রোধ করে মারছি না? আসলে সেজন্যে তোমার কাছে যেতে হবে। সে ঝুঁকি আমি নেব না।'

মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো ভুল দেখছে ও, পরমুহূর্তে চেহারা থেকে সমস্ত অনুভূতির ছাপ মুছে ফেলল। টানেল ধরে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে একটা মূর্তি। সাদা একটা ভুতুড়ে আকৃতি। নিঃশব্দ, নিশ্চিত পদক্ষেপে আসছে। পরনে ফায়ার ব্রিগেড কর্মীদের পোশাক, মাথায় হেলমেট, পিঠে ট্যাঙ্ক, গ্লাভ্স্ পরা হাতে লম্বা একটা নায্ল্। ফ্লেম থ্রোয়ার নিয়ে এগিয়ে আসছে লোকটা, ওদের দু'জনকে পুড়িয়ে মারার মতলব!

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অস্ট্রেলিয়ানের মনোযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করল রানা। হাসল জোর করে। 'বাঁচার কি কোনও উপায়ই নেই? মরতেই হবে আমাকে?'

আরেকবার ঘড়ি দেখল ক্যালডন। 'সময় প্রায় শেষ। কিভাবে মরতে চাও, রানা? বুকে গুলি খাবে, না পিঠে? অনেকে বলে পিঠে গুলি খাওয়াটাই নাকি সোজা, কে জানে!' হ্যামারটা কক করল সে। 'চিন্তা কোরো না, গুলি ফস্কায় না আমার। এক গুলিতে মরে যাবে, টেরও পাবে না কখন মরেছ।'

ফ্লেম থ্রোয়ার হাতে নিয়ে অসির পেছনে দরজার কাছে চলে এসেছে লোকটা। ফেস মাস্কের তলায় আবছা ভাবে লোকটার সাদা নাক দেখতে পেল রানা। ফ্লেম থ্রোয়ারের নায্ল্টা সরাসরি অস্ট্রেলিয়ানের পিঠে তাক করেছে সে।

ঠিক সময় বেছে নিয়ে চেয়ার থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল রানা। ক্যালডনও ট্রিগার টেনেছে, পেছনের লোকটাও ফ্লেম থ্রোয়ার চালু করেছে। কমলা আগুনের একটা বিস্ফোরণ দেখতে পেল রানা, ও জানে মাত্র একটা সুযোগই পাবে ও, সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে, অস্ট্রেলিয়ান ওর গায়ে গুলি লাগতে না পারলে লোকটাকে ওর বর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, এছাড়া আর কোনও উপায় নেই বাঁচার।

ঘাড় থেকে শুরু করে পাছা পর্যন্ত আধ ইঞ্চি গভীর একটা ক্ষত তৈরি করে চলে গেল বুলেটটা, তখনও রানা শূন্যে। রক্তাক্ত একটা ক্ষত, কিন্তু মারাত্মক নয়। সারাদেহে আগুন ধরে যাওয়ায় আর্তচিৎকার করে উঠেছে ক্যালডন, দড়াম করে তার সঙ্গে বাড়ি খেল রানার দেহ। আরেকবার গর্জে উঠল রিভলভারটা। ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে ফ্লেম থ্রোয়ারের গায়ে ফেলল রানা।

নায্লটা হাত থেকে ফেলে দিয়েছে ফায়ার সুট পরা লোকটা, ঘুরে দৌড় দিতে গেল, পরমুহূর্তে হোসের সঙ্গে পা বেধে আছাড় খেয়ে পড়ল মাটিতে। চিতাবাঘের মত ঝাঁপ দিল রানা, লোকটার কাছে পৌঁছেই পায়ের পাশ দিয়ে গায়ের জোরে লাথি মারল হেলমেটের নিচে, পরপর কয়েকটা লাথি মারল। অবশ করে দিতে চাইছে প্রতিপক্ষকে। মড়াৎ করে একটা আওয়াজ হলো। লোকটার কলার বোন ভেঙে গেছে। প্রবল ঝটকা দিয়ে স্থির হয়ে গেল মাটিতে পড়া দেহটা। দ্রুত হাতে হেলমেট খুলল রানা, অবাক হয়ে গেল কোরা ল্যানযসের চেহারা দেখে। পেছন ফিরে তাকাল গোঙানি শুনে। মেঝেতে দাপাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান মেজর। শক্তিশালী অগ্নিশিখায় পিঠ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। চিড়বিড় আওয়াজ করে এখনও পুড়ছে চর্বি। মেঝে হাতড়াচ্ছে লোকটা। রিভলভারটা হাতে পেয়ে মাথায় নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিল। আস্তে করে নেতিয়ে পড়ল দেহটা।

ফায়ার সুট খুলতে খুলতে মেয়েটার পাল্স্ দেখল রানা। নেই। মারা গেছে মেয়েটা। মেয়েটা কেন এখানে ভেবে সময় নষ্ট করল না ও, চটপট কোরার গায়ে বড় হওয়া ফায়ার সুট খুলে পরতে শুরু করল। পরা সেরে হেলমেট চাপিয়ে নিল মাথায়। পিঠে ফুয়েল ট্যাঙ্ক ঝুলিয়ে স্ট্র্যাপ আটকে নিল, নায্লটা হাতে নিয়ে দীর্ঘ টানেল ধরে হাঁটতে শুরু করল, যেপথে এসেছিল।

ব্যথায় মনে হচ্ছে মরে যাবে ও। জোর করে ব্যথা ভুলে মাথাটাকে সচল রাখল। ধীরে ধীরে একটা পরিকল্পনা আকৃতি নিচ্ছে ওর মাথায়। কবীর চৌধুরীকে যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, নইলে ব্যর্থ হতে হবে।

বাঁক নিয়ে একটা করিডরে ঢুকল রানা, অন্যপ্রান্তে ভিলা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ আছে। দু'জন প্রহরী বাইরের খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, কিন্তু তাদের কেউই রানার দিকে মনোযোগ দিল না। দেখে মনে হলো দেখেইনি। হয়

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

এরকমই নির্দেশ আছে তাদের ওপর, অথবা এই একই ঘটনা আগেও ঘটতে দেখেছে তারা। গার্ডদের পাশ কাটিয়ে ঝড়ো রাতের আঁধারে বেরিয়ে এলো রানা।

পুরোটা সময় ওর হাত ছিল ট্রিগারে। মুহূর্তে জ্বলে পুড়ে মারা যেত লোকগুলো, যদি বাধা দেয়ার চেষ্টা করত।

গরমে দরদর করে ঘামছে রানা সুটের ভেতর। বাইরের আঁধারে মিশে গিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলল ও।

সাত

ভিলার উত্তরে এক হাজার গজ দূরে খালাতো কলাগাছ, পালমেটো আর সোয়াম্প ঘাসের ঘন জঙ্গলের ভেতর থামল রানা, ফ্লেম থ্রোয়ারটা ফেলে দিয়ে একটা ডোবার মধ্যে নেমে আচ্ছামত সারা গায়ে কাদা মাখল। জ্বলুনি কমল অনেক। রানার মাথার বেশিরভাগ চুলই পুড়ে গেছে। অবশ্য চেহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, দুয়েকটা ছোট ফোস্কা ছাড়া। টের পাচ্ছে কাঁধে আর বুকে বিরাট বিরাট ফোস্কা উঠছে, ভেতরটা ভরে উঠছে পানিতে।

কাদায় শুয়ে আরেকবার ভেবে দেখল রানা, সময় নষ্ট করবে না কবীর চৌধুরী। অন্তত এই পরিস্থিতিতে নয়। সোনাবাহী জাহাজ কাছে চলে আসার কথা। হাইতিতেও আগ্রাসন চালানোর সময় হয়ে গিয়েছে। প্রহরীদের অবশ্য সতর্ক করে দেয়া হবে, হয়তো সেনাবাহিনী নামানো হবে ওর খোঁজে। এই ছোট দ্বীপে চিরুনী চালানো হলে ধরা পড়তে দেরি হবে না ওর। তবে কবীর চৌধুরী ভেবে নিতে পারে উপকূলের দিকে রওনা হয়ে গেছে ও, সেক্ষেত্রে বেশি ঝামেলায় যাবে না, চেষ্টা করবে সরকারী ভাবে ওকে আটক করতে। সামনে একটাই কাজ, স্থির করল রানা। যেভাবে হোক উদ্ধার করতে হবে সোনা।

সুইম ট্রাঙ্কটা ছাড়া আর সব কিছুই কেড়ে নেয়া হয়েছে ওর কাছ থেকে। অস্ত্র দরকার একটা। সেই সঙ্গে দরকার তথ্য। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কবীর চৌধুরীর পিটি বোটগুলোর দিকে চলল রানা, মাঝে মাঝে এখানে ওখানে টর্চের আলো দেখতে পাচ্ছে। নড়ছে আলোগুলো, এদিক ওদিক যাচ্ছে। মনে হলো না ওর মুক্তিলাভের খবর কবীর চৌধুরীর কানে গেছে। কোরার দেরি দেখলে খোঁজ নিয়ে জানবে চৌধুরী।

ঝড় তার রূপ পাল্টেছে, হারিকেনের কেন্দ্র এখান থেকে অনেক দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে গেছে, ফলে বাতাসের ঝাপটা এসে লাগছে গ্যালোস কে'তে। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, সেই সঙ্গে গল্‌ফ্ বলের সমান একেকটা শিল পড়ছে। দু'হাতে মাথা ঢেকে এগিয়ে চলল রানা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মুহূর্তের জন্যে। দিনের মত আলোকিত হয়ে যাচ্ছে চারপাশ।

পিটি বোটগুলো যে পাহাড়ী গুহার ভেতরে রাখা হয়েছে তার কাছে চলে এলো রানা, কোমর সমান উঁচু ঘাসের ভেতর থেকে সামনের দিকে তাকাল। পরবর্তী বিজলির আলোয় দেখতে পেল যা আশা করেছিল। এখনও নেটের তলায় পিয়ারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে বোটগুলো। গুহার ভেতর থেকে গার্ডদের গলার আওয়াজ পেল। একজন আরেকজনের কাছে সিগারেট চাওয়ায় অনুযোগ করছে লোকটা।

নিঃশব্দে পানিতে নেমে সাঁতার শুরু করল রানা, ডুব সাঁতার দিয়ে গুহামুখ পেরিয়ে মাথা তুলল পিটি বোটগুলোর পাশে। তাস পেটাচ্ছে গার্ডরা এখনও। কেউ সতর্ক করেনি এদের। এবার রানা ভাল করে লক্ষ করল বোটগুলো। আশি ফুট দীর্ঘ একেকটা, মেহগনি কাঠের খোল। ডেক আর সুপারস্ট্রাকচার প্লাই উডের। তিনটে পঞ্চাশ ক্যালিবার মেশিনগান আছে তিনদিকে। সামনে পেছনে আছে চল্লিশ এম এম দুটো কামান। টর্পেডো টিউবগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যা ফায়ার পাওয়ার আছে তাই যথেষ্ট, হাইতির নেভির এটুকুও নেই। পিটি বোটগুলো তীরে সৈন্য নামানোর জন্যে চমৎকার কাজে আসবে। এমনকি বাধার মুখেও খুব একটা অসুবিধে হবে না সৈন্য নামাতে। সাগরের অবস্থা যত খারাপই হোক, ধকল সামলাতে পারবে বোটগুলো। ফোস্কার জ্বালা আর বুলেটের ক্ষতর ব্যথা নিয়ে তিক্ত হাসল রানা, ওকেও পারতে হবে।

ফ্ল্যাগ শিপের কম্প্যানিয়নওয়েতে উঠে পিছলে অন্ধকার এঞ্জিন রূমে নামল রানা। আগের বার খেয়াল করেনি, এবার গন্ধ পেয়ে বুঝল পুরোনো প্যাকার্ড এঞ্জিন সরিয়ে ডিজেল এঞ্জিন বসানো হয়েছে। হাতড়ে আন্দাজ করল সম্ভবত অ্যাটলাস টাইপের এঞ্জিন। প্রচুর গতি তুলতে পারবে প্রয়োজনে।

বোটটা একবার ঘুরে দেখে পেইন্ট লকারের সামনে থামল রানা। পিটি বোটে এটাই একমাত্র জায়গা যেখানে ও লুকিয়ে থাকতে পারবে। সন্দেহ না করলে বোধহয় বোটগুলো সার্চ করা হবে না। সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। ওর পালানোর খবর জানা গেলে কবীর চৌধুরী ধরে নেবে পালাতে ব্যস্ত ও। দ্বীপের অন্য দিকে ওকে খুঁজবে তার লোকরা, প্রহরী বেষ্টিত পিটি বোটে নয়।

দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো ওকে, প্রতিটা মুহূর্ত কাটল চরম উৎকণ্ঠায়। বুক-পেট জ্বলে যাচ্ছে। ফোস্কাগুলো মনে হচ্ছে আগুন দিয়ে তৈরি। দপদপ করছে বুলেটের ক্ষতটা। খুটখাট কিছু আওয়াজ হলো বাইরে। দোল খেল বোট। তেমন কিছু শুনতে পাচ্ছে না রানা, তবে আন্দাজ করল বেশি ক্রু ওঠেনি বোটে। কারণ বুঝতে পারল না, বোঝার উপায়ও নেই, এখন এখান থেকে বের হওয়া মানে ধরা পড়ে যাওয়া। কবীর চৌধুরীকে চড়া গলায় নির্দেশ দিতে শুনল। স্বস্তির শ্বাস ফেলল রানা, ঠিক বোটেই উঠেছে ও। একই সঙ্গে চিন্তাও হলো। যদি হাইতির বীচে পৌঁছে যায় তাহলে কি করবে তখন? সঙ্গে অস্ত্র নেই, খারাপ ভাবে পুড়ে গেছে শরীর, জ্বর আসছে গা কাঁপিয়ে। জোর করে মাথা থেকে চিন্তাগুলো দূর করল ও।

পিটি বোট খোলা সাগরে বেরিয়ে আসার পর চিন্তা করার আর অবকাশ মিলল না রানার, বারবার এদিক-ওদিক বাড়ি খাচ্ছে ও পেইন্ট লকারের দেয়ালে,

www.MurchOna.com

ব্যথায় মনে হচ্ছে মরে যাবে। দু'হাত দু'দিকে ঠেকিয়ে শরীর সামলানোর চেষ্টা করছে ও। কিছুটা সফলতা এলো। চল্লিশ নট গতিতে ছুটছে এলকো এঞ্জিন, ঢেউয়ের ওপর দিয়ে লাফ দিচ্ছে বোটের বো, দড়াম করে পড়ছে পরমুহূর্তে। সাগরের ঢেউগুলো অন্তত আট থেকে দশ ফুট উঁচু হবে, আন্দাজ করল রানা।

একঘণ্টার কিছু বেশি সময় এক নাগাড়ে এগিয়ে চলল বোট, তারপর এঞ্জিন বন্ধ করা হলো। ঝাঁকি কমে এলো অনেক। স্বাভাবিকের চেয়ে কম। তার মানে হয় কোনও বন্দরে থেমেছে ওরা, অথবা বড় কোনও জাহাজের পাশে।

লোকজনের আওয়াজ কমে আসার পর পেইন্ট লকার থেকে বের হয়ে মৃদু আলোকিত গ্যালিতে চলে এলো রানা। সমস্ত আসবাবপত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে, সম্ভবত বেশি লোক ধরানোর জন্যে। সাবধানে ক্রু আর অফিসার্স কোয়ার্টার পার হলো রানা। আবছা আলোয় এবার দেখতে পেল আগে যা চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। সমস্ত পার্টিশন আর বাঙ্ক খুলে ফেলা হয়েছে জায়গা বাড়ানোর জন্যে। এখন বোটে পঞ্চাশ থেকে ষাটজন লোককে সহজেই জায়গা করে দেয়া যাবে। খালি এঞ্জিন রুমে উঁকি দিয়ে হিসেব করল রানা, ছয়টা পিটি বোটে পঞ্চাশজন করে মোট তিনশোজন। প্রথম দফায় হাইতির সৈকতে তিনশো সৈন্য নামাতে পারবে কবীর চৌধুরী, তারপর বোটগুলো ফেরত পাঠাতে পারবে তার সবুজ ইউনিফর্ম পরা বাকি সৈন্যদের নিয়ে আসতে। মিরাগনের সৈকতে যদি সৈন্য নামায় তাহলে গ্যালোস কে থেকে দূরত্ব দাঁড়াবে চারশো মাইল। সেখান থেকে সরাসরি পেনিনসুলা পেরিয়ে পোর্ট অ প্রিন্সে রাজধানীতে আক্রমণ চালানো সম্ভব। পিটি বোটগুলো এই আবহাওয়ায় ঘণ্টায় তিরিশ মাইল বেগে ছুটতে পারবে। তারমানে বারো ঘণ্টা লাগবে হাইতিতে পৌঁছোতে। হাইতির দিকে যায়নি ওরা, নিশ্চিত হলো রানা।

ছায়ায় দাঁড়িয়ে ওপর থেকে ভেসে আসা আওয়াজগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল রানা। বোঝার চেষ্টা করছে কোন্টা কিসের আওয়াজ। এঞ্জিন রুম পার হয়ে কম্প্যানিয়নওয়েতে উঁকি দিল। পিটি বোটের ডেক ভেসে যাচ্ছে উজ্জ্বল সাদা আলোয়। আলোটা বোট থেকে আসছে না। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে সামনে বাড়ল ও, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল, থামল তিন ধাপ সিঁড়ি বাকি থাকতে। কোনাকুনি ভাবে ওপর দিকটা দেখতে পাচ্ছে এখন। জং ধরা একটা বিরাট উঁচু বাঁকা দেয়ালের মত লাগল ওর কাছে জাহাজের খোলটা। ওই জাহাজ থেকেই আলোটা ফেলা হয়েছে নিচে। আরেক ধাপ উঠল রানা।

এবার দড়ির মইটা দেখতে পেল, জাহাজের পাশ থেকে বোটে ফেলা হয়েছে। কবীর চৌধুরী নিজের লোকদের উঠতে দেখছে মইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে। শেষ লোকটা উঠে যাবার পর দ্রুত ওঠার জন্যে পা ব্যবহার না করে দু'হাতের সাহায্যে উঠতে শুরু করল কবীর চৌধুরী, তরতর করে উঠে যাচ্ছে, ফুলে ফুলে উঠছে কাঁধের পেশী।

একজন গার্ড রেখে গেছে বোটে। মনে মনে গাল বকল রানা। ও আশা করেছিল জাহাজে উঠে দেখবে কি ঘটে। কবীর চৌধুরীকে ও যতটা চেনে তাতে ওর ধারণা ঠিক হলে বিরাট গণ্ডগোল বেধে যাবে এখন চিনা জাহাজে।

কবীর চৌধুরী মই বেয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর গার্ডের দিকে মনোযোগ দিল রানা। লোকটাকে শেষ করতে হবে, বুঝতে পারছে। প্রহরী ওর কাজটা সহজ করে দিল এঞ্জিন রুমের সামনে কম্প্যানিয়নওয়েতে অবস্থান নিয়ে। ছয় ফুট দূরে আছে রানা, একটু নিচে। লোকটার পায়ের দিকে তাকাল রানা। পায়ে কমব্যাট বুট। জি আই সারপ্লাস। বারবার পায়ের ভর বদল করছে লোকটা। নার্ভাস। তাকিয়ে আছে চিনা জাহাজটার দিকে। কিছু একটা ঘটবে সেজন্যে অপেক্ষা করছে যেন।

আস্তে করে সামনে এগোল রানা, হাত দুটো বাড়িয়ে রেখেছে, জুতো ধরবে বলে। পিঠে টান পড়তেই টের পেল কাদার নিচে খুলে গেছে বুলেটের ক্ষতটার মুখ। পোড়া জায়গার জ্বলুনি এতই বেশি যে ক্ষতটার কথা ভুলে গিয়েছিল ও।

দু'হাতে বুট জুতো বেড় দিয়ে ধরেই হ্যাঁচকা টান মারল রানা, পিছিয়ে যাচ্ছে সেই সঙ্গে। দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ল প্রহরী মেঝের ওপর, মাথা ঠুকে গেল খটাস করে। চিতাবাঘের মত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা, লোকটার বেল্ট থেকে ট্রেঞ্চ নাইফটা টান দিয়ে বের করেই বসিয়ে দিল গলায়। মোটা রগটা কেটে যাওয়ায় ফিনকি দিয়ে উঠল রক্ত, ওর বুকে ছিটে লাগল।

দুর্বল লাগছে ওর, পেট-বুকের জ্বলুনি বেড়ে গেছে আরও। জ্বরও বাড়ছে, ঘুরছে মাথা। অবসাদে ঘুম চলে আসছে। পেশীগুলো শিথিল হয়ে আসতে চাইছে। ভয় হলো রানার, অজ্ঞান না হয়ে যায়। চেতনা হারালে বাঁচার আর কোনও আশা নেই।

গার্ডের বেল্ট খুলে পিস্তল আর গ্রেনেড কোমরে ঝোলাল রানা, পুরোনো থম্পসন সাবমেশিনগানটা একবার চেক করে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। লোকটার পকেট হাতড়াল সাবমেশিনগানের নলটা বন্ধ করার মত কিছু পাবার আশায়। আরও একটু সাঁতরাতে হবে ওকে। একটা রুমাল হলেই কাজ চলে যায়। রুমাল নেই, কিন্তু গার্ডের পকেটে এক প্যাকেট কন্ডম পেল। একটা কন্ডমই নলের ডগায় পরাল রানা, মোচড় মেরে জিনিসটা টাইট করে আটকে নিল। লাশটা পেইন্ট লকারে লুকিয়ে রেখে এক টুকরো কাপড় দিয়ে রক্ত মুছে ফেলল।

রানা এখন মানসিক ভাবে তৈরি। কম্প্যানিয়নওয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল। আলোটা বিপদে ফেলে দিতে পারে, কিন্তু ওটা নেভানোর কোনও উপায় নেই, সেটা হবে আরও দ্রুত ধরা পড়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। আশা করল পিটি বোটের স্টার্নে পৌঁছে যেতে পারবে ও কারও চোখে ধরা না পড়েই।

পা বাড়িয়েই মুহূর্তের জন্যে থামল রানা, পরমুহূর্তে আবার এগোল। চাইনিজ জাহাজে দোজখ নেমে এসেছে। ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট করে হুঙ্কার ছাড়ছে অনেকগুলো টমিগান। বুম-বুম করে ফাটছে গ্রেনেড। পিস্তলের আওয়াজও শুনতে

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

পেল রানা। আলোটা নিভে গেল। ওপর থেকে ভেসে এলো মৃত্যুপথযাত্রী এক লোকের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার।

একটা ঢেউ পিটি বোটটাকে ওপরে তুলে বাড়ি মারল জাহাজের খোলের সঙ্গে। আগে পা দিয়ে সাগরে নামল রানা, চেহারা গম্ভীর, ওর ধারণাই সঠিক হয়েছে, চাইনিজ জাহাজের একজন ক্রুকেও বাঁচতে দেবে না কবীর চৌধুরী। সাক্ষী রাখতে অভ্যস্ত নয় সে।

আট

পানির তলা দিয়ে জাহাজটার স্টার্নের দিকে এগোল রানা। যেকোন সময়ে আবার বাতি জ্বলে উঠবে, পরিষ্কার দেখা যাবে ওকে, সাবমেশিনগান দিয়ে ফুটো করে দেয়া হবে, তার আগেই পৌঁছোতে চাইছে।

জাহাজের পাশ থেকে বেরিয়ে স্টার্নের দিকে এগোতেই প্রবল ঢেউয়ের মধ্যে পড়ল রানা। আগের চেয়ে বাতাস আর বৃষ্টির উন্মত্ততা কমেছে, কিন্তু এখনও সাত থেকে আট ফুট উঁচু হয়ে মাথায় সাদা ফেনা নিয়ে ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে ঢেউগুলো। দম নিতে উঠে ঢেউয়ের ধাক্কায় আরেকটু হলেই ভারসাম্য হারিয়ে স্রোতের টানে খোলা সাগরের দিকে চলে যেত ও। একেবারে শেষ মুহূর্তে জাহাজের নোঙরের শেকল হাতে পেয়ে আঁকড়ে ধরল।

বিরাট একটা ঢেউ ওকে এক্সপ্রেস এলিভেটরের মত ওপরের দিকে ঠেলে দিল। জং ধরা কেব্‌ল্‌টা ধরে কোনও মতে টিকে থাকল রানা। বারবার টানটান হচ্ছে কেব্‌ল্‌, আবার ঢেউ চলে যেতে ঢিলে হচ্ছে। এমনিতে শেকল বেয়ে ওপরে ওঠা কঠিন হতো না রানার জন্যে, কিন্তু এই শারীরিক অবস্থায় কাজটাকে এখন খুব কঠিন বলে মনে হচ্ছে। আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠছে রানা, টের পাচ্ছে পিঠের ক্ষতটা টান খেয়ে আরও চওড়া হচ্ছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে দু'পাশের মাংসপেশী।

আর এক মিনিট, তারপরই জাহাজের ডেকে উঠে পড়তে পারবে ও, লুকিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবতে পারবে।

আর বারো ফুট ওপরে ডেকের রেইলিং। বাতাসের ধাক্কায় দুলছে রানা, যেন পাপেটের পুতুল। বাতাস আর বৃষ্টির শোঁ-শোঁ আওয়াজ ছাপিয়ে এখনও টমিগানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও। মাঝে মাঝে গ্রেনেড ফাটছে। ডেকের নিচে কোথাও থেকে সাবমেশিনগানের টাশ্‌-টাশ্‌ আওয়াজ আসছে। থেমে গেল অস্ত্রটা। একটা গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো। তারপর নামল নীরবতা। একটা লোক চিৎকার করে কি যেন বলল। আবার নীরবতা নামল। শুধু ঝড়-বৃষ্টির একটানা আওয়াজ চলছে যেন অনন্তকাল ধরে।

ডেকে এখনও বাতি জ্বালানো হয়নি। বাতাসের আওয়াজের মাঝেও রানার মনে হলো কবীর চৌধুরীর গলা শুনতে পেল, নির্দেশ দিচ্ছে। ডেকের রেইলিঙের ওপর দিয়ে সাবধানে উঁকি দিল রানা, আবছা ভাবে ডেকটা দেখতে পাচ্ছে। পুব আকাশে ধূসরের সামান্য ছোঁয়া লেগেছে, সূর্যের আগমনী ঘোষণা করছে আলোটা।

আফটার ওয়েল ডেকে নামার একটা লোহার মই দেখতে পেল রানা, ওটা বেয়ে দ্রুত নেমে গেল নিচে, হামাগুড়ি দিয়ে বসল দেয়ালের পাশে। ঠিক সময় মত নিচে নেমেছে ও। অন্ধকারে ওকে পাশ কাটাল চারজনের একটা দল, মই বেয়ে উঠতে শুরু করল ফ্যানটেইলের দিকে, নিজেদের মধ্যে স্প্যানিশে আলাপ করছে উত্তেজিত স্বরে। তারপুলিনের স্পর্শ পেয়ে ওটার তলায় ঢুকল রানা, হাতড়াতে লাগল হ্যাচ কাভারের খোঁজে। একটা হ্যাচ কাভার অন্তত থাকার কথা এখানে। নেই। দুই নম্বর হোল্ডটা ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা, বাতাসের ঝাপটায় তারপুলিনের কোনা ছিঁড়ে সেটাই ওর হাতে লেগেছিল। ইচ্ছে করলে হোল্ডে নামা যায়।

দুটো ব্যাপার রানাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল। ডেকটা কেঁপে উঠেছে জাহাজের, প্রাচীন এঞ্জিন সচল হয়েছে, বুঝতে পারল ও। জাহাজের পেছনটা ভয়ানক ভাবে দুলে উঠল, আরেকটু হলে তারপুলিনের তলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেত রানা। সেই চারজন লোক যারা ওপরে গেছে, তারা নোঙর তুলে ফেলেছে। ঝড়ের দিকে পাশ ফিরে হেলে-দুলে এগোতে শুরু করেছে জাহাজ।

বাতি জ্বলে উঠল, ডেক ভেসে গেল উজ্জ্বল সোনালী আলোয়। কেউ একজন বোধহয় ভুল করে বাতি জ্বেলেছে। কিন্তু এখানে একমুহূর্ত থাকাও এখন বিপজ্জনক। ফ্যানটেইলে এখনও আছে লোকগুলো।

হ্যাচ কোমিঙের ওপর দিয়ে দেহটা গড়িয়ে দিল রানা, তারপর দু'হাতের জোরে কিছুক্ষণ ঝুলে হোল্ডের অন্ধকারে শরীরটা ছেড়ে দিল। ভয় পাচ্ছে বেকায়দা পড়ে পা না ভেঙে যায়।

দশ ফুট নিচে পড়ল ও, চার হাত-পায়ে ভারসাম্য রক্ষা করে হাঁটু মুড়ে বসল। নিচে মসৃণ কাঠের পাটাতন। হাত বোলাল রানা, স্টীলের পাত ঠেকল হাতে, তারপর একসারি পেরেকের মাথা। একটা বাক্সের ওপর পড়েছে ও। হাতড়ে দেখল, হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। ছয় ফুট দীর্ঘ আর চার ফুট চওড়া প্রতিটা বাক্স, পুরো হোল্ড জুড়ে পাশাপাশি সাজানো। নিচে কয়টা বাক্স আছে কে জানে।

দুই বিলিয়ন ডলারের সোনা।

হ্যাচ কোমিং থেকে আসা একচিলতে আলো মিলিয়ে গেল, ডেকের বাতিটা নিভে গেছে। নিশ্চয়ই রাইডিং লাইটও নিভিয়ে দেয়া হয়েছে, কবীর চৌধুরী কোনও ঝুঁকি নেবে না। তবে একটু পরই ভোর হবে। বাংলার গৌরব নিশ্চয়ই দূরে নেই আর। চিনা জাহাজটাকে স্পট করতে পারলে দখল করে নেয়া শক্ত হবে না।

ট্রেঞ্চ নাইফ দিয়ে একটা বাক্স খোলার চেষ্টা করল রানা। অনেকক্ষণ লাগল ওর। খুব শক্ত করে ইস্পাতের পাত লাগানো হয়েছে, স্ক্রুগুলোও টাইট করে

www.MurchOna.com

আটকানো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুলতে পারল ও।

ভেতরে হাত চালিয়ে হতাশ হতে হলো রানাকে। হাতড়ে বুঝল একটা রাশিয়ান সাবমেশিনগান ঠেকেছে হাতে। পুরনো মডেলের জিনিস, কসমোলিন তেলে চুপচুপ করছে। অনেকবছর হলো রাশিয়ানরা আর এই জিনিস বানায় না। পুরো বাক্স হাতিয়ে দেখল রানা, পাঁচটা সাবমেশিনগান ঠেকল ওর হাতে।

অস্ত্রগুলো সরিয়ে হাত চালাল, শক্ত কাগজ নিচে। ছুরি দিয়ে কাগজ চিরল ও, মসৃণ শীতল ধাতুর স্পর্শ পেল। সোনা তাহলে অস্ত্রের নিচে লুকিয়ে আনা হয়েছে!

সোনার ওপর হাত বুলিয়ে ভাবল রানা, কাকে বোকা বানানোর জন্যে এই সতর্কতা?

নিঃশব্দে হাসল রানা। কবীর চৌধুরীর নিজের লোকদের বোকা বানানোর জন্যেই এই ব্যবস্থা। লোকগুলো বোধহয় কেউ সোনার খবর জানেও না। যত পাগলাটেই হোক, কাউকে বিশ্বাস করার বান্দা নয় কবীর চৌধুরী।

যত চোর-ডাকাত-খুনে-বদমাশদের এক করেছে কবীর চৌধুরী, নানা অপরাধে নিশ্চয়ই খোঁজা হচ্ছে তাদের। এক ডলারের জন্যে নিজের মায়ের গলা কাটতেও বাধবে না এধরনের মানুষই জোগাড় করেছে পাগলা বিজ্ঞানী। লোকগুলো সোনার খোঁজ পেলে হাইতি আক্রমণের আশা শেষ, নিজেদের ভেতর ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত লড়াই বাধিয়ে বসবে সবাই, কবীর চৌধুরীর আওতার বাইরে চলে যাবে পরিস্থিতি।

বাক্সের ঢাকনি নামিয়ে রাখল রানা, অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ায় হোল্ডের নিচে আর সামনে থেকে একটা হলুদ আলো আসছে, সেটা চোখে পড়ল। নিঃশব্দে এগোল রানা আলোটা লক্ষ্য করে, ভাবছে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়ার কথা চিন্তা করছে কবীর চৌধুরী। লোকটা কি করবে তার ওপরই নির্ভর করবে ও নিজে কিভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে।

বাক্সের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গুনল রানা। ওপর দিকে নয়টা বাক্স, তার নিচে হোল্ডের স্টীল ডেক। আলোটা আসছে ছয় ফুট বাই তিন ফুট একটা বাল্কহেড থেকে, সামান্য ফাঁক হয়ে আছে দরজাটা। শেষ যে লোকটা বেরিয়েছে এখান থেকে সে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে। হোল্ড থেকে বেরোবার এটাও একটা পথ হতে পারে, কিন্তু আপাতত বের হবার কোনও ইচ্ছে নেই রানার। সোনা এখানে আছে, আগে হোক পরে হোক কবীর চৌধুরীকে এখানে আসতেই হবে। বাক্সগুলোর ওপর চিৎ হলো রানা, বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে, তাকিয়ে আছে হ্যাচের ওপরে পাতা ক্যানভাসের দিকে। হোল্ডের তুলনায় ওপরে আলো বেশি, ক্যানভাসটার রং হালকা দেখাচ্ছে।

এল কংকুইসটেডরের পূপ কেবিনটার কথা মনে পড়ল। স্টীলের বীম দিয়ে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে কেবিনটা। হাসল রানা, এখন ও জানে কোথায় সোনা রাখবে ঠিক করেছিল কবীর চৌধুরী। এল কংকুইসটেডর ধ্বংসাবশেষ হিসেবে এতই পরিচিত যে ওখানে কেউ সোনা খুঁজতে যাবে না। কিন্তু ওদিকেই কি যাচ্ছে কবীর চৌধুরী? তার একটাই মানে, রানা যে মুক্ত সে খবর সে জানে না। কিন্তু এতটা অসতর্ক কি হবে পাগল বিজ্ঞানী? অসম্ভব। তাহলে? তাকে পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হবে, অন্য কোথাও লুকাতে হবে সোনা। কোথায়?

বাইরে আলো আরও বাড়ছে, তারপুলিনের ভেতর দিয়ে ধূসর আভা আসতে শুরু করেছে।

অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই রানার। হোল্ড থেকে বেরিয়ে সুবিধে হবে না। অন্তত বিশজন লোক আছে কবীর চৌধুরীর সঙ্গে। কিছুই করতে পারবে না ও এতজনের বিরুদ্ধে।

বেশিক্ষণ রানাকে অপেক্ষা করতে হলো না। প্রাচীন এঞ্জিনের ধুকপুকানি থেমে গেল। আস্তে আস্তে বন্ধ হলো ডেকের কাঁপুনি। গতি থেমে যাওয়ায় জাহাজের দুলুনি বেড়ে গেল। টমিগানটা তুলে নিয়ে বাল্কহেডের দিকে এগোল রানা, বুঝতে পারছে না কবীর চৌধুরী জাহাজ থামাল কেন। এক ঘণ্টাও হয়নি রওনা হয়েছে ওরা। পনোরো নট গতিতেও যদি এগিয়ে থাকে, বেশিদূর আসেনি ওরা। কংকুইসটেডরের কাছে তো নয়ই।

তবে নিশ্চিত হওয়ার কোনও উপায় নেই। পিটি বোট যখন জাহাজটার সঙ্গে ভিড়ল তখন ওটা কোথায় ছিল তা জানা নেই। কবীর চৌধুরী জানে কোথায় থেমেছে সে। সম্ভবত গোটা জাহাজে একমাত্র কবীর চৌধুরীই জানে। দলে এঞ্জিনিয়ার আর নাবিক আছে লোকটার, তারা জাহাজটাকে চালিয়ে এনেছে। কিন্তু কতজন নেভিগেটর বা প্রাক্তন অফিসার আছে তার সঙ্গে? সম্ভবত একজনকেও রাখেনি কবীর চৌধুরী। রাখার কথা নয়।

শিরশির করে উঠল রানার পিঠ। মনে হচ্ছে কি যেন নজর এড়িয়ে গেছে ওর। কবীর চৌধুরীকে ছোট করে দেখার দুঃসাহস নেই ওর, কিন্তু কোথায় যেন ভুল হয়ে গেছে একটা। টমিগানের নল দিয়ে ঠেলে বাল্কহেডটা খুলল রানা, দেখল সবুজ ইউনিফর্ম পরা একটা লোক মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে। দরজা ফাঁক করে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল রানা, সামনের নির্জন করিডরটা দেখল। অনুজ্জ্বল হলুদ আলো জ্বলছে করিডরে। দুলে উঠল রানা, কাত হয়ে যাচ্ছে ওর শরীরটা। মাথা ঘুরে উঠল। ভয় হলো, সত্যিই কি এই বিপদের সময় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে ও?

দু'সেকেন্ড পর বুঝতে পারল জাহাজটাই অস্বাভাবিক ভাবে দুলছে। ক্যাঁচকোঁচ নানা আওয়াজ করছে। পানির ছল-ছল কল-কল আওয়াজ শুনতে পেল। টমিগানের সেফটি ক্যাচ অফ করে করিডর ধরে দ্রুত পায়ে এগোল রানা, ব্রিজের নিচে চলে এলো। করিডর থেকে দু'পাশে যে দরজাগুলো সেগুলো অফিসারদের কোয়ার্টারে গেছে। খোলা একটা দরজা পেরোনোর সময় বাঙ্কের ওপর পড়ে থাকা লাশটা চোখে পড়ল ওর, গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আরেকটা লোক পড়ে আছে মেঝেতে, রক্তাক্ত দু'হাত পেট খামচে আছে। কবীর চৌধুরীর লোকরা সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায় পেয়েছিল চিনা

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

ক্রুদের।

ঝড়ো বাতাসে আগের মত আর দুলছে না জাহাজটা, গা নড়াচ্ছে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও। পোর্টের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এখন রানা বুঝতে পারছে কারণ, তবু নিশ্চিত হতে হবে ওকে। মইটার কাছে চলে এসেছে ও, একটু আগে এই মই বেয়েই ওপরে উঠেছে সবুজ ইউনিফর্ম পরা লোকটা। অর্ধেক উঠতেই পানির জোরাল আওয়াজ শুনতে পেল। আওয়াজটা সাগর থেকে আসছে না, আসছে ভেতর থেকে!

মই বেয়ে এঞ্জিন রূমে ঢুকল রানা। কয়েকটা লাশ পড়ে আছে শুধু, জীবিত আর কেউ নেই এখন এখানে। আরেকটা মই বেয়ে নিচে নেমে বিল্জের কাছে চলে এলো ও। ট্র্যাপডোরটা এখন খোলা। মই বেয়ে নামতে হলো না ওকে, দেখতে পেল কালো পানি ধীরে ধীরে উঠে আসছে ওর দিকে।

জাহাজের প্রত্যেকটা সী-কক সম্ভবত খুলে দেয়া হয়েছে কবীর চৌধুরীর নির্দেশে। ডুবিয়ে দিচ্ছে কবীর চৌধুরী স্বর্ণবাহী জাহাজটাকে। ওটা কোথায় আছে সেটা সে ছাড়া আর কেউ জানে না!

নয়

প্রাণ হাতে নিয়ে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল রানা, ভয় পাচ্ছে যেকোন সময়ে ডুবে যাবে জাহাজটা। ওপরে না উঠলে বোঝা যাবে না ঠিক কতটা সময় হাতে আছে আর। যে করে হোক জানতে হবে কোথায় আছে ওরা। এত বিপদের মাঝেও কবীর চৌধুরীর প্রশংসা না করে পারল না ও। লোকটা তার আসল পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে, এল কংকুইসটেডরে সোনা লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয় জেনে নতুন পরিকল্পনা করেছে, বোকা বানিয়ে দিয়েছে ওকে।

কম্প্যানিয়নওয়েতে পৌঁছে থামল রানা, কান পাতল, বাতাসের আওয়াজের ওপর দিয়ে লোকজনের গলার আওয়াজ শুনতে চেষ্টা করল। সামনেই ব্রিজ। ব্রিজে কেউ নেই। দূরে সরে যাচ্ছে লোকজনের নির্দেশ, গলার আওয়াজ আর চিৎকার। সাবধানে কম্প্যানিয়নওয়েতে উঠে এলো রানা। লোকগুলো এখনও জাহাজ ত্যাগ করেনি। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। লোকগুলো চলে যাবার পর রেডিয়ো রূমে যাবে ও, চেষ্টা করবে সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তবে রেডিয়ো আস্ত রাখার কথা নয় কবীর চৌধুরীর। জাহাজটা ডুবে যাবার আগেই একটা লাইফ র‍্যাফটে উঠতে হবে ওকে। দু'পাশে তাকিয়ে বুঝতে পারল হাতে অন্তত আরও এক ঘণ্টা সময় আছে, তার আগে ডুববে না প্রকাণ্ড জাহাজটা। ততক্ষণে কবীর চৌধুরী চলে যাবে ওর ধরাছোঁয়ার বাইরে।

ব্রিজে কেউ নেই। হুইলটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে যাতে জাহাজটা যতটা সম্ভব ঝড়ো বাতাসের দিকে পাশ ফিরে থাকে। ক্রল করে পোর্ট সাইডে পৌঁছোল রানা। ওদিকেই কাত হচ্ছে জাহাজটা, কাজেই ওদিক দিয়েই নেমে যাবে কবীর চৌধুরীর ক্রুরা। ওদিকে তাদের বোট থাকবে। ডেক ধরে এগোচ্ছে রানা, জাহাজটা একটা ঝাঁকি খেয়ে আরও কাত হলো।

পোর্ট বো থেকে সাবধানে উঁকি দিল রানা, দেখতে পেল জাহাজের গায়ে ঠেকে আছে পিটি বোটটা। ওটা সঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে। কবীর চৌধুরী সবার শেষে নেমেছে বোটে, জাহাজের দিকে তাকিয়ে আছে। লোভ হলো রানার, টমিগানের এক পশলা বুলেট বৃষ্টিতে লোকটাকে খতম করে দেয়া যায়। পরমুহূর্তে আস্তে করে মাথা নাড়ল। সেক্ষেত্রে ওকেও মরতে হবে। ক্রুরা ওকে ছাড়বে না। পিটি বোট নিয়ে অপেক্ষায় থাকবে, জাহাজটা ডুবে যাবার পর পাখি শিকার করার মত নিশ্চিন্তে গুলি করে মারবে ওকে।

টমিগান মেঝেতে নামিয়ে রাখল রানা, ওর হাত ভেজা ঠাণ্ডা কিসে যেন স্পর্শ করল। ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে নিল রানা, তাকিয়ে দেখল ওটা একজন লোকের চেহারার অংশ। লোকটার ইউনিফর্মে দুটো স্ট্রাইপ। মেট ছিল এজাহাজের। এতক্ষণ লাশটা চোখে পড়েনি। এখন তাকানোয় দেখতে পেল কোনায় পড়ে আছে আরেকজন। হেল্ম্স্ম্যান। নিহতদের সাগরেই কবর দিচ্ছে কবীর চৌধুরী। তিক্ত মনে ভাবল রানা, কি করবে। পাগল বৈজ্ঞানিককে চলে যেতে না দিয়ে কোনও উপায় নেই ওর। সামনের সাগর থেকে ঘুরে এলো দৃষ্টি, কোথাও বাংলার গৌরবের চিহ্নমাত্র নেই।

বাতাস এখন বিশ নট গতিতে বইছে। সাগর অপেক্ষাকৃত শান্ত। ঢেউগুলো পিটি বোটটাকে দোলাচ্ছে। ওর চোখের সামনে রওনা হয়ে গেল বোট। স্টার্নে বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে কবীর চৌধুরী, মাথায় সবুজ ক্যাপ, হাতে একটা বিনকিউলার, ওটা চোখে তুলে জাহাজটার দিকে তাকাল। মাথা নিচু করে নিল রানা, আবার যখন মাথা তুলল তখন ওর হাতেও ক্যাপ্টেনের বিনকিউলার। হাসছে কবীর চৌধুরী। ঘাড়ের কাছে চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল রানার। ওর মনে হলো লোকটা যেন ওকে দেখেই হাসছে।

কাঁধে স্ট্রাইপ লাগানো এক অফিসার কবীর চৌধুরীর পেছনে দাঁড়িয়ে কি যেন বলল। চোখ থেকে বিনকিউলার নামাল না কবীর চৌধুরী, জবাব দেয়ার আগে ভ্রূ কুঁচকে উঠল, চেপে বসল চোয়ালের হাড়। তার কথা শুনে দ্রুত ভেতরে চলে গেল অফিসার।

স্পীড বেড়ে গেল পিটি বোটের, এখন অন্তত বিশ নট গতিতে ছুটছে ঢেউ ভেঙে। তিনশো গজ দূরে সরে গেছে বোটটা, একটু পরই মেঘলা আকাশের কারণে দেখা যাবে না। তখন রানা রেডিও রূমে গিয়ে সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবে। তারপর একটা লাইফ র‍্যাফট বা বোট দরকার হবে সাগরে ভেসে থাকার জন্যে। ওর পক্ষে সাঁতরে উপকূলে পৌঁছোনো সম্ভব নয়।

কবীর চৌধুরীকে রিস্টওয়াচের দিকে তাকাতে দেখল রানা। ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

ও, কিন্তু থমকে গেল। কবীর চৌধুরীকে দেখে মনে হচ্ছে যেন উত্তেজনায় কাঁপছে। ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বোটের ডেকে একা। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না রানা। বোটের স্টার্ন থেকে লাফ দিয়ে সাগরে পড়েছে কবীর চৌধুরী। সাঁতরাতে শুরু করল। জাহাজের দিকে আসছে! বারবার ঢেউয়ের ভেতর ডুবছে-উঠছে তার মাথা।

পিটি বোটটা কবীর চৌধুরীর একশো গজ দূরে সরে গেছে। অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হলো ওটা। তীব্র উজ্জ্বল কমলা-লাল-হলুদ রশ্মি বিচ্ছুরিত হলো চারদিকে। পরমুহূর্তে ভেসে এলো বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ। ছিটকে আকাশে উঠল বোটের সহস্র টুকরো। এক পলক তাকিয়েই রানা বুঝতে পারল ওই বোটে একজন লোকও জীবিত নেই।

আবার কবীর চৌধুরীর ওপরে বিনকিউলার ফেরাল রানা। আসছে লোকটা। মাথায় এখন আর সবুজ ক্যাপটা নেই। সমস্ত ক্রু সহ পিটি বোট উড়িয়ে দিয়েছে পাগল বৈজ্ঞানিক। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েছে কাজটা করতে গিয়ে। সময়ের একটু ভুল হলে নিজেও সে শেষ হয়ে যেত। একজন সাক্ষীও রাখেনি। মেরুদণ্ডের কাছটা শিরশির করে উঠল রানার, নিষ্ঠুরতা দেখে ও অভ্যস্ত, কিন্তু এর বুঝি কোনও তুলনা হয় না।

ডুবন্ত জাহাজের পোর্ট সাইডের একশো গজের ভেতর চলে এসেছে চৌধুরী। আর পঞ্চাশ গজ। আর দু'তিন মিনিট পরই পোর্ট রেইল থেকে ঝুলন্ত দড়ির মই বেয়ে উঠে আসবে জাহাজে। শীতল হাসল রানা, ও অপেক্ষা করবে।

দুলে উঠে পোর্টের দিকে আরও ঝুঁকে গেল চিনা জাহাজ। আলোগুলো একবার নিভে আবার জ্বলে উঠল, তারপর নিভে গেল চিরতরে। জাহাজের পেটের ভেতর থেকে চাপা একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। ডুবে যেতে আর বড়জোর এক ঘণ্টা। হয়তো তার চেয়েও কম।

ব্রিজ থেকে বের হয়ে টমিগানটা চেক করল রানা, তারপর মই বেয়ে নেমে এলো ডেকে। অপেক্ষা করছে। কবীর চৌধুরী যেকোন সময়ে মই বেয়ে উঠে আসবে।

আকাশে মেঘের ঘনত্ব বেড়েছে, আলো এতই কম যে এখন আর ডেকের ওপাশে রেইলিংটাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। পোর্টের দিকে আরও ঝুঁকছে জাহাজটা, রেইলিঙের ওপর দিয়ে উঁচু ঢেউগুলোর পানি ঢুকতে শুরু করেছে। বাতাস বেড়েছে আগের চেয়ে, কিন্তু পেটে পানি ভরা জাহাজটাকে তেমন দোলাতে পারছে না।

টমিগান রেইলিঙের দিকে তাক করে আছে রানা, অধৈর্য বোধ করছে। এত দেরি করছে কেন কবীর চৌধুরী? শেষ পর্যন্ত কি পৌঁছোতে পারেনি? সাগর অশান্ত , জাহাজের গায়ে আছড়ে ফেলেছে হয়তো লোকটাকে। অজ্ঞান হয়ে গেলে মারা পড়বে লোকটা।

হঠাৎ করেই দমকা বাতাস ছাড়ল। ওই বাতাসের কারণেই বেঁচে গেল রানা। ওর মাথা থেকে এক ইঞ্চি দূরে ডেকহাউসিঙের গায়ে বিঁধল বুলেট। কবীর চৌধুরী পেছনে!

মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শরীরটাকে গড়িয়ে দিল রানা, জানল না রিফ্লেক্স ওকে দ্বিতীয়বার বাঁচাল। রানার মাথা থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে বাতাসে শিস কেটে ছুটে গেল দ্বিতীয় বুলেট। প্রথম কম্প্যানিয়নওয়ের কাছে পৌঁছেই উন্মত্তের মত ঝাঁপ দিয়ে নিচে পড়ল রানা, শূন্যে থাকা অবস্থাতেই শুনতে পেল কবীর চৌধুরীর কর্কশ হাসির আওয়াজ।

সাবমেশিনগানটা হারিয়েছে রানা, একটা ইন্সপেকশন করিডরে পড়েছে, বাল্কহেডের কাছাকাছি উঠে দাঁড়াল। ট্রেঞ্চ নাইফ, পিস্তল আর গ্রেনেড ছাড়া এখন ওর কাছে আর কোনও অস্ত্র নেই। টমি গানটা কবীর চৌধুরীর দখলে। সাবমেশিনগানের বিরুদ্ধে পিস্তল কাজে আসবে না। গলা শুকিয়ে গেল রানার।

'রানা?' ভরাট গলায় ডাকল কবীর চৌধুরী।

'হ্যাঁ, কবীর চৌধুরী,' জবাব দিল রানা। 'কি চাও?' শুনতে পাচ্ছে নানা রকম আওয়াজ। ডেকের নিচ থেকে এখন অদ্ভুত সব শব্দ ভেসে আসছে। ডুবতে আর বেশি দেরি নেই জাহাজটার।

'শুনতে পাচ্ছ, রানা?'

'পাচ্ছি। বলো।'

গলার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে কম্প্যানিয়নওয়ের ঠিক গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে পাগল বিজ্ঞানী। কাভার নিয়েছে নিশ্চয়ই, হাতে আছে টমি গান। আপাতত সুবিধেজনক অবস্থানে আছে সে, কিন্তু রানা যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ নিশ্চিন্তে কোনও কাজ করতে পারবে না, সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে। সে সময় কবীর চৌধুরীর হাতে নেই। শীঘ্রি একটা বোট বা র‍্যাফট নিয়ে সরে পড়তে হবে তাকে, নইলে এই ক্ষুব্ধ সাগরে স্রেফ মারা পড়বে।

'শুনছ, রানা?'

'শুনছি।'

'তাহলে শোনো মনোযোগ দিয়ে। চালমাত অবস্থায় পৌঁছে গেছি আমরা। নিচে তোমাকে আমি ফাঁদে ফেলেছি, কিন্তু তুমি যতক্ষণ বেঁচে আছ ততক্ষণ মটর লঞ্চ সাগরে নামানো আমার পক্ষে অসম্ভব। তার চেয়ে আসো, একটা চুক্তি করি। জানো নিশ্চয়ই, দুই বিলিয়ন ডলারের সোনা আছে এজাহাজে। সোনা ভাগ করে নেব আমরা। এছাড়া আর কোনও উপায় নেই রানা। নইলে দু'জনকেই মরতে হবে এখানে। জাহাজটা আর একঘণ্টাও টিকবে না। তোমাকে আমি যুক্তিপূর্ণ মানুষ হিসেবে জানি। রানা, কি বলো? এক বিলিয়ন ডলারের মালিক হওয়া ডুবে মরার চেয়ে ভাল না?'

'তা ভাল। কিন্তু তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না, কবীর চৌধুরী।' সময় চাইছে রানা একটা কিছু করার জন্যে। 'ভাল কথা, কবীর চৌধরী, আমার পেছনে এলে কিভাবে তুমি?'

'স্টারবোর্ড রেইলে একটা মই রেখে দিয়েছিলাম আমি আগেই। বিনকিউলার দিয়ে তোমাকে দেখেছিলাম। আগেই জানতাম জাহাজে তুমি

www.MurchOna.com

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

আছ।'

'কিভাবে?'

'পেইন্ট লকারে গার্ডের লাশটা খুঁজে পেয়েছিলাম আমি।'

জেনেশুনেও ফিরে এসেছে কবীর চৌধুরী। কতটা দুঃসাহস সেটা অনুভব করে আরেকবার শিউরে উঠল রানা। ঠাণ্ডা মাথার প্রতিভাবান এক নিষ্ঠুর খুনী, ওঁৎ পেতে আছে এখন ওকে খুন করার জন্যে।

'কি হলো, রানা? সিদ্ধান্ত নাও। হাতে সময় নেই।'

'ঠিক আছে,' গলা চড়াল রানা। 'আগে টমি গানটা নিচে ফেলো, তাহলে বিশ্বাস করব তোমার সদিচ্ছা আছে।'

মুহূর্তের নীরবতা। বাতাসের আওয়াজ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। তারপর কবীর চৌধুরীর গলা ভেসে এলো। 'ঠিক আছে, রানা। আমি জানি তোমার কাছে গার্ডের পিস্তল আর ছোরা আছে। পিস্তল আমার কাছেও আছে। মেশিনগানটা আমি নিচে ফেলছি, কিন্তু তারপর কিভাবে আমাদের মাঝে চুক্তি হবে?'

'সামনে যাবে তুমি,' বলল রানা, 'বো'র দিকে। আমি যাব অ্যাফটের দিকে। দু'জন দু'জনকে দেখার পর সামনাসামনি এগোব। দু'জনই আমরা মাথার ওপর হাত তুলে রাখব। দু'জন মুখোমুখি হলে পরস্পরকে আমরা খুন করতে পারি, অথবা পিস্তল ফেলে দিতে পারি। আগে টমি গান ফেলো।'

'বেশ। এই যে টমি গান।'

চালাকিটার জন্যে তৈরি ছিল রানা, তারপরও আরেকটু হলে মারা পড়ত। সজোরে টমি গান সিঁড়ির গায়ে বাড়ি মেরে নিচে ছুঁড়ে ফেলেছে কবীর চৌধুরী, যাতে পড়ন্ত গ্রেনেডের ড্রপ খাওয়ার আওয়াজ ওর কানে না যায়। রানার পায়ের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে থামল গ্রেনেডটা। লাফ দিয়ে পড়ল রানা দূরে, তারপর দ্রুত ক্রল করতে শুরু করল, গ্রেনেডের বিপজ্জনক আওতার বাইরে চলে গেল দু'সেকেন্ডেরও আগে।

বদ্ধ জায়গায় বিকট আওয়াজ করে ফাটল গ্রেনেড। শরীরের কয়েক জায়গায় স্প্লিন্টারের কামড় অনুভব করল রানা। সময় নিল না, আর্তচিৎকার করে উঠল গলা ফাটিয়ে, থেমে গেল মাঝপথে। চিৎকার থামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্টার্নের দিকে ছুটল ও। প্রতিটি সেকেন্ড এখন মূল্যবান। কবীর চৌধুরী হয়তো দু'এক মিনিট সময় নষ্ট করবে রানা সত্যি মারা গেছে কিনা দেখতে। তবে মনে হয় না। জাহাজ ডুবে যাবে যেকোন সময়ে। এখন তার মটর লঞ্চের দিকে বেশি মনোযোগ দেয়ার কথা।

ছুটছে রানা আবছা আলোয়। বারবার বাড়ি খাচ্ছে বাল্কহেডের সঙ্গে, খোঁচা লাগছে চোখা জিনিসের, পাত্তা দিচ্ছে না। থামল না সোনা ভরা হোল্ডের কাছে পৌঁছোনো পর্যন্ত। বাক্সগুলো একের পর এক পার হলো ও, হোল্ড কোমিঙের দিকে তাকিয়ে ওপরের তারপুলিন দেখে হতাশায় ছেয়ে গেল মন। শারীরিক এই অবস্থায় দশ ফুট উঁচুতে কিনারা আঁকড়ে ওপরে ওঠা ওর পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হলো না।

লাফ দিল রানা। এক ফুট বাকি থাকল কিনারা থেকে। ঘুরে দাঁড়াল উদ্‌ভ্রান্তের মত, বুঝতে পারছে হাতে একদম সময় নেই। কবীর চৌধুরী রওনা হয়ে গেলে তাকে হাতের মুঠোয় পাবার আর কোনও উপায় থাকবে না।

পাগলের মত একটা বাক্স ধরে টানাহ্যাঁচড়া আরম্ভ করল ও। জানে না অস্ত্র এবং সোনা সহ ভারী বাক্স তুলতে পারবে কিনা। দু'বার চেষ্টার পর জায়গা থেকে বেরিয়ে এলো বাক্স। রানার কাঁধ-পিঠ-কোমরে যেন আগুন ধরে গেল। ওটাকে লম্বালম্বি করে দাঁড় করিয়ে ওপরে উঠল রানা, মিনিট পুরো হবার আগেই কোমিং দিয়ে উঠে পড়ল ডেকে। সোজা ছুটল স্টারবোর্ড রেইলের দিকে। রেইলটা ধরে রেখেছে, যাতে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে না যায়। জাহাজের পোর্ট রেইলটা এখন পানির প্রায় সমান্তরালে চলে এসেছে। সাগরের পানি ঢুকছে হড়হড় করে। কবীর চৌধুরী যদি মটর লঞ্চ নামিয়ে থাকে তাহলে এতক্ষণে নামিয়ে ফেলেছে, অথবা দেরি করে ফেলেছে, আর পারবে না।

ফরোয়ার্ড ডেক হাউসিং ঘুরেই লঞ্চটাকে দেখতে পেল রানা, রেইলের পাশে ভাসছে। সমস্ত দড়ি এখনও খোলা হয়নি বলে রওনা দিতে পারেনি চৌধুরী। শেষ দড়িটা নিয়ে পাগলের মত টানাহ্যাঁচড়া করছে সে এখন। তার দশ ফুটের ভেতর গিয়ে দাঁড়াল রানা, পিস্তল তাক করল। কবীর চৌধুরী মুখ তুলে তাকাচ্ছে না।

'নড়বে না, কবীর চৌধুরী,' কড়া গলায় নির্দেশ দিল রানা, দেখল চমকে গেছে লোকটা। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখটা।

আস্তে আস্তে কবীর চৌধুরীর ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। 'তাহলে শেষ পর্যন্ত তুমিই জিতলে, রানা! ভেবেছিলাম চিৎকারটা তোমার চালাকি হতে পারে, কিন্তু চেক করার সময় হাতে ছিল না। আমাকে নিয়ে কি করবে ভাবছ?'

'আইনের হাতে তুলে দেব।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল কবীর চৌধুরী। 'না, রানা, তা তুমি পারবে না। পারতে; যদি ঠাণ্ডা মাথার খুনী হতে। আমি সাগরে নেমে যাব, রানা, প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করব। প্রকৃতির হাতে মরতে আমার আপত্তি নেই। মানুষের হাতে মৃত্যু, সে আমার জন্যে নয়।' বিষণ্ন হাসল কবীর চৌধুরী। 'এই সাগরে আধঘণ্টার বেশি আমি টিকব না, রানা। যেতে দাও আমাকে।' রানার চোখের দিকে তাকাল। 'হয় যেতে দাও, নয়তো এখানে এখনই গুলি করে মেরে ফেলো।'

পাগল বৈজ্ঞানিকের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা একদৃষ্টিতে। আস্তে করে নামিয়ে নিল পিস্তল। 'যাও।'

শেষ বারের মত রানার দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সাগরে ঝাঁপ দিল। পাঁচ মিনিট মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল রানা। দূরে চলে যাচ্ছে কবীর চৌধুরী। আর বেশিক্ষণ সাঁতরাতে পারবে না। সাগর আবার অশান্ত হয়ে উঠছে। তীর থেকে অন্তত দশ মাইল দূরে আছে ওরা। কবীর চৌধুরী মারা যাবে।

www.MurchOna.com

সত্যিকার প্রতিভাবান কিন্তু বিপথগামী একজন মানুষের করুণ পরিণতির সাক্ষী ও, দীর্ঘশ্বাস ফেলে লঞ্চে উঠল রানা, দড়ি কেটে ওটাকে মুক্ত করে দিল। জাহাজ থেকে সরে এলো লঞ্চ, দুলছে ঢেউয়ের দোলায়। অন্তত এক হাজার গজ চলে গেছে কবীর চৌধুরী, আর বেশিক্ষণ তাকে দেখা যাবে না এই মেঘলা বিক্ষুব্ধ আবহাওয়ায়। তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর নিজেকে উজবুক মনে হলো ওর।

কবীর চৌধুরীর সরাসরি সামনে একটা সাবমারসিবলের কালো রঙের কনিং টাওয়ার ভেসে উঠেছে! তিন মিনিটের মাথায় রানার চোখের সামনে সাবমারসিবলের ভেতর ঢুকে গেল কবীর চৌধুরী, একটু পরই বেরিয়ে এলো আবার। হাতে একটা মেগাফোন।

স্পষ্ট শুনতে পেল রানা কবীর চৌধুরীর কণ্ঠ। 'রানা, ডুবিয়ে মারব তোমাকে আমি। বিদায়।'

আরেকটু হলেই সাবমারসিবলটা চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে যেত। নিচু মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তেড়ে ফুঁড়ে ওটাকে পাশ কাটাল বাংলার গৌরব, মাস্তুলে পতপত করে উড়ছে বাংলাদেশী পতাকা।

চমকে গেল কবীর চৌধুরী, সামলে নিয়ে মেগাফোনটা আবার মুখের সামনে তুলল। 'পারলাম না, রানা। এবার তুমিই জিতলে। তবে ভেবো না পার পাবে। আবার দেখা হবে আমাদের।'

সাবমারসিবলের ভেতর ঢুকে গেল সে। ডুবে গেল সাবমারসিবলটা। মাথার ওপর গুঞ্জন শুনল রানা। অনেকগুলো প্লেন যাচ্ছে।

ওর লঞ্চের পাশে থামল ডেস্ট্রয়ার, দড়ির মই ফেলা হলো নিচে। লঞ্চ ছেড়ে ডেস্ট্রয়ারে উঠল রানা, ডেকে পা দিতেই ওকে জড়িয়ে ধরল সোহেল।

কাতরে উঠল রানা, 'আস্তে, শালা, আহত হয়েছি।'

তাড়াতাড়ি রানাকে ছেড়ে দিল সোহেল, অপ্রস্তুত হেসে বলল, 'শেষ দৃশ্যটা দেখবি না?' আঙুল তুলে দেখাল। 'ওদিকে তাকিয়ে থাক্।'

পাঁচ মিনিট পর দেখা গেল আগুনের ঝিলিক। বহুদূর থেকে ভেসে এলো ভোঁতা ভারী গর্জন। আমেরিকান বম্বার বোমা ফেলছে গ্যালোস কে'তে।

'পাঁচশো মেরিন নামবে,' জানাল সোহেল। 'কবীর চৌধুরী ধরা পড়বে সদলবলে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমার ভুলে আবারও ফস্কে গেছে কবীর চৌধুরী।' ডুবন্ত জাহাজটা দেখাল। 'কনক তরী।'

'হ্যাঁ,' ডুবন্ত জাহাজটার দিকে তাকাল সোহেল, 'স্বর্ণতরী। তুই থাক্, আমি এক্ষুণি আসছি।'

দ্রুত পায়ে ব্রিজের দিকে চলে গেল সোহেল, সেখান থেকে রেডিয়ো রুম হয়ে ফিরে এলো একটু পর। রানা একদৃষ্টিতে দিগন্তের আগুনের ঝিলিক দেখছে। রানার কাঁধে হাত রাখল সোহেল। 'গভীরতা মাত্র তিরিশ ফ্যাদম। কালকের মধ্যে সোনা তুলে রওনা হয়ে যাব আমরা দেশের পথে। ডেস্ট্রয়ারে চিকিৎসক আছে, তোর কোনও অসুবিধে হবে না। বসকে জানিয়েছি মিশন সাক্সেসফুল। নিজে থেকে এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করেছেন তিনি তোকে।'

আস্তে করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, সোহেলের সঙ্গে পা বাড়াল। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। নানা জায়গায় জ্বলছে পুড়ছে চামড়া মাংস। বিশ্রাম দরকার ওর। অনেক বিশ্রাম। সুস্থ হলেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে কোনও না কোনও অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে। তারপর একদিন কোনও এক অ্যাসাইনমেন্ট থেকে আর ফিরবে না ও।

***

Under The Licence Of Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike

www.MurchOna.com